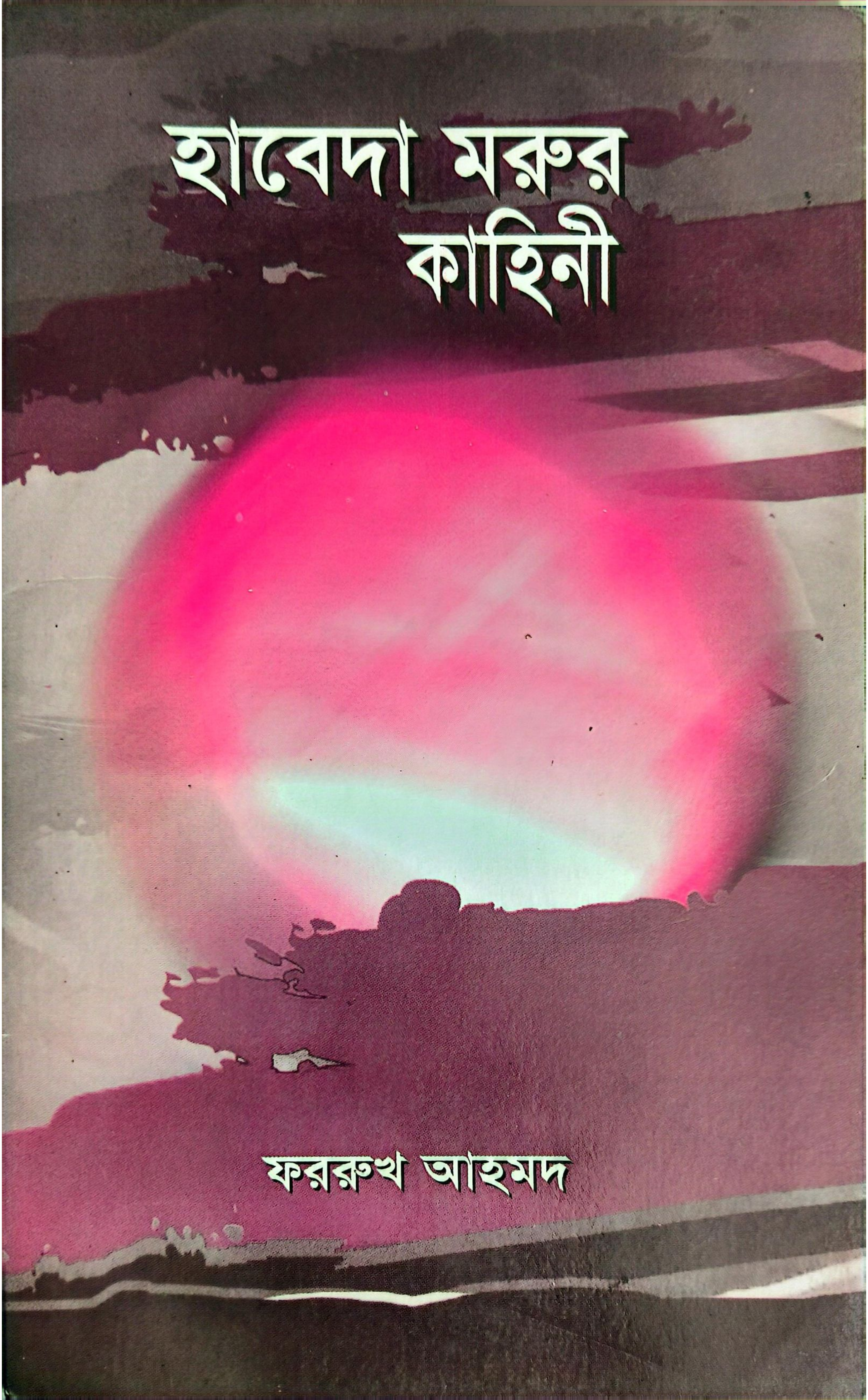
হাবেদা মরুর কাহিনী



ফররুখ আহমদ

ঈদে মিলাদুন্নবী (সা) ১৪২৬ হিজরি উপলক্ষে প্রকাশিত

হাবেদা মরুর কাহিনী

ফররুখ আহমদ

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

হাবেদা মরুর কাহিনী
ফররুখ আহমদ
পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ৫২
ইফাবা প্রকাশনা : ৯১৭/১
ইফাবা গ্রন্থাগার : ৮৯১.৪৪১
ISBN : 984-06-0986-6

প্রথম প্রকাশ
সেপ্টেম্বর ১৯৮১

দ্বিতীয় সংস্করণ
ফেব্রুয়ারি ২০০৫
মাঘ ১৪১১
যিলহজ্জ ১৪২৫

মহাপরিচালক
এ. জেড. এম. শামসুল আলম

প্রকাশক
মোহাম্মদ আবদুর রব
পরিচালক, প্রকাশনা বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
ফোন ঃ ৮১২৮০৬৮

প্রচ্ছদ
জসিম উদ্দিন

মুদ্রণ ও বাঁধাই
এ.এম.এম. সিরাজুল ইসলাম
ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রেস
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

মূল্য ঃ ২২.০০ টাকা

HABEDA MORUR KAHINI—(The Episode of the Habeda Desert in Poetry) : Composed by Forrukh Ahmad in Bangla and published by Muhammad Abdur Rab, Director Publication, Islamic Foundation Bangladesh, Agargaon, Sher-e-Bangla Nagar, Dhaka-1207. Phone : 8128068 February 2005

E-mail:info@islamicfoundation-bd.org
Website:www.islamicfoundation-bd.org

Price : Tk. 22.00; US $: 00.75

প্রকাশকের কথা

ইসলামী রেনেসাঁর কবি ফররুখ আহ্‌মদের 'হাবেদা মরুর কাহিনী' একটি রূপকাশ্রিত গদ্য-কাব্য। গদ্য-ছন্দে লেখা কবির একমাত্র কাব্যগ্রন্থ এটি। ফররুখ আহ্‌মদ তাঁর কাব্যে ইতোপূর্বেও রূপক ও প্রতীকের ব্যবহার করেছেন। কিন্তু গদ্য-ছন্দে রূপক ও প্রতীকের ব্যবহারে তিনি যে অসাধারণ পারঙ্গমতা দেখিয়েছেন বাংলা কবিতার ইতিহাসে, বিশেষ করে ইসলামী ভাবাদর্শের কাব্য রচনার ক্ষেত্রে, তা একটি গৌরবোজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে আছে।

কবির ভাষায় 'হাবেদা মরুর' অন্য নাম হচ্ছে 'হাওয়ার ময়দান'। এই হাওয়ার ময়দানে কবি যুগযন্ত্রণা, দুর্নীতি ও যাপিত সময়ের দুরবস্থাকে 'জুলমতের হিংস্র ছায়ার' সাথে তুলনা করে হতাশাদীর্ণ মানুষকে আশা ও আশ্বাসের বাণী শুনিয়েছেন, তাদের দেখিয়েছেন উজ্জীবন ও মুক্তির পথ।

এ গদ্য-কাব্য গ্রন্থটি বাংলা সাহিত্যে একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন। এটি ইসলামিক ফাউন্ডেশন থেকে প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৮১ সালে। বর্তমানে এর দ্বিতীয় সংস্করণ কাব্যরস পিপাসু পাঠকদের সামনে উপস্থাপন করতে পেরে আমরা আনন্দবোধ করছি। একই সাথে ইসলামী রেনেসাঁর এই মরহুম কবির রূহের মাগফিরাত কামনা করছি।

আল্লাহ্ আমাদের সকল শুভ প্রচেষ্টা কবূল করুন। আমীন!

মোহাম্মদ আবদুর রব
পরিচালক, প্রকাশনা বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

ভূমিকা

ফররুখ আহমদের 'হাবেদা মরুর কাহিনী' গদ্য-ছন্দে লেখা একটি 'রূপক' কাব্য। কবিতায় রূপক ও প্রতীক ব্যবহারের তাৎপর্য এবং এক্ষেত্রে ফররুখ আহমদের প্রচেষ্টা ও সাফল্যের পরিমাপ করতে হলে, একথা প্রথমেই মনে রাখতে হবে যে, কবিতায় রূপক ও প্রতীকের ব্যবহার কবির গভীর জীবনবোধ এবং জীবন-দৃষ্টির পরিচায়ক। কিছুটা দার্শনিক মনের অধিকারী ও জীবন এবং জগৎ সম্পর্কে বক্তব্যপ্রবণ না হলে, রূপক ও প্রতীক ব্যবহারের দিকে কবি-মন তেমন ঝুঁকতে চায় না; বক্তব্যের রূপকাশ্রিত এবং প্রতীকী উপস্থাপনার গুরুত্ব ও তাৎপর্য থেকে যায় উপলব্ধি ও বোধের অগোচরে।'

বস্তুত অনুভূতি, উপলব্ধি, স্বপ্ন-কল্পনা ও আবেগ-আর্তিকে যারা সরল উপস্থাপনায় এবং নিছক বর্ণনার মাধ্যমে তুলে ধরে পরিতৃপ্তি বোধ করেন না, তারা গভীরতা ও ব্যঞ্জনাধর্মিতা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে রূপক ও প্রতীকাশ্রয়ী হন। ব্যক্তিমনের প্রকাশে যেমন, সার্বজনীন মনের প্রকাশে এবং জাতীয় চৈতন্যের রূপায়ণেও তেমনি, অনেক কবিকেই রূপক ও প্রতীকের শরণ নিতে দেখা যায় ; কারো কারো সৃষ্টিতে রূপক এবং প্রতীক অঙ্গাঙ্গী সম্পর্কের মতো হয়ে দাঁড়ায়, যেমন চিত্রকল্পের মধ্যেও উপমা অন্তর্লীন বা সংগোপন থাকে, তেমনি রূপক-প্রতীকও ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে থাকা ছাড়াও, পরস্পর অন্তরিত হয়ে থাকে।

ফররুখ আহমদের কবিতায়ও রূপক ও প্রতীকের ব্যবহার আছে। তাঁর রচিত খণ্ড কবিতায় যেমন, তেমনি কাহিনী কাব্যে এবং নাটকেও প্রতীকের ব্যবহার দৃষ্টিগ্রাহ্য, অনুভবযোগ্য। তাঁর 'সাত সাগরের মাঝি' কাব্যগ্রন্থে নাবিক, নদী-সমুদ্র ও প্রত্যাশিত বন্দর রূপ পেয়েছে ইতিহাসের পটে, আদর্শ-আশ্রিত প্রতিভাসে ও উজ্জীবনী প্রেরণায়। 'সিন্দাবাদ'-এর প্রতীক তিনি ইসলামী আদর্শ ও মুসলিম সভ্যতার পুনরুজ্জীবনের আকাঙ্ক্ষাই ভাষা দিয়েছেন। এক্ষেত্রে তিনি উপজীব্য ও বক্তব্য বিষয়কে প্রত্যক্ষভাবে না এনে রূপ-প্রতীকের মাধ্যমে পরোক্ষ-পদ্ধতিতে রূপায়িত করার বিশেষ কবি-কৌশল ও শিল্পরীতি অবলম্বন করেছেন। ফলে নাবিক, সমুদ্র, নিশান, পাখি, পাঞ্জেরী ইত্যাদি একটি আদর্শ-উজ্জীবিত ও সভ্যতা-সংস্কৃতির ধারক মানবগোষ্ঠীর নতুন ও প্রত্যয়ী আকাঙ্ক্ষার প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়েছে। অশ্রান্ত সন্ধানী, সমুদ্রবিজয়ী নাবিক 'সিন্দাবাদ' ফররুখ আহমদের দৃষ্টিতে 'মুসলিম সমাজ' ও 'মুসলিম চেতনা, মুসলিম গৌরব ও অভিযানের প্রতীক, 'হেরা' পর্বত অনুপ্রেরণার উৎস, আদর্শ ভূমি ও স্বর্গের প্রতীক—

যেখানে হযরত মোহাম্মদ (সা) ঐশী আহ্বান লাভ করেছিলেন। (সৈয়দ আলী আশরাফ, বাংলা সাহিত্যে মুসলিম ঐতিহ্য, পৃ. ৫০)

বিশ্বের বিভিন্ন দেশের কাব্যেই পাখি একটি বহুল-ব্যবহৃত প্রতীক ও 'রূপক'। বাংলা সাহিত্যেও যুগে যুগে পাখি রূপক ও প্রতীক হয়ে ভাষা পেয়েছে। সেই প্রাচীন কবিতা ও আদি গীতিগাথার কথা না হয় বাদই দেয়া যাক, আঠারো শতকের মরমী কবি লালন ফকির যখন উচ্চারণ করেন ঃ

খাঁচার ভিতর অচিন পাখি ক্যামনে আসে যায়।
ধরতে পারলে মনো-বেড়ি দিতাম তাহার পায়,—

তখন এর রূপকী ও প্রতীকী ব্যঞ্জনা চেতনায় আঘাত হানে, মুগ্ধ করে। আধুনিক কালের কবিরাও ব্যক্তিসত্তার প্রতীকে, অজানা ও রহস্য-নিবিড় মনের রূপকে এবং আরও নানাভাবে পাখিকে দেখেছেন, বিচিত্রধর্মী কবিতা লিখেছেন। ফররুখ আহমদের কবিতায়ও পাখি একটি প্রধান প্রতীক। তিনি যখন 'ডাহুক'-এর প্রতীকে মুক্ত-মানুষ ও আত্মার কথা বলেছেন এবং শৃঙ্খলিত সত্তার জন্যে আহাজারী করেছেন, তখনও কাব্য-সৌন্দর্যের উদ্বোধনের পাশাপাশি সমকালীন জীবনচেতনাও বাঙময় হয়েছে।

কীটসের মতো 'পাখি'-কে মুক্ত-আত্মার প্রতীক হিসাবে ব্যবহার করেছেন ফররুখ আহমদ 'ডাহুক' কবিতায়। কীটসের নাইটিঙ্গেল যেমন পয়েজি বা শিল্পকলার নামান্তর, ফররুখ আহমদের 'ডাহুক' তেমনি মুক্ত-আত্মার প্রতীক—মুক্তিপিয়াসী মনের সংগ্রামের সঙ্গে মুক্ত-আত্মার একটা তুলনামূলক চিত্র উপস্থাপিত হয়েছে 'ডাহুক' কবিতায়। পার্থক্য সম্ভবত এই যে, কীটস নাইটিঙ্গেলকে আবহমান কালের পটভূমিকায় স্থাপন করেছেন, আর 'ডাহুক' একটি বিশেষ সময়-পরিস্থিতিতে ইতিহাসের পটভূমিকায় চিত্রিত। প্রত্যক্ষভাবে কোনো উল্লেখ না থাকলেও বৃটিশ-পরাধীনতা যুগের মর্ম বেদনা এবং উপমহাদেশের মানুষের মুক্তিকামী মনের প্রতিফলন আর স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষাও যে এতে বাঙময়, তা বুঝে নিতে কষ্ট হয় না।

একালে রূপক ও প্রতীকের ব্যবহার শুধু মানস-সংকট, আধ্যাত্মিক ধ্যান-ধারণা, উপলব্ধি, জীবন চেতনা ও অন্বেষার মধ্যেই সীমায়িত নেই, তার এলাকা আরও বিস্তৃত হয়েছে। ফররুখ আহমদের অনেক কবিতায়ও এর পরিচয় মেলে। ফররুখ আহমদ ছিলেন ইসলামী আদর্শ ও জীবনদর্শনে বিশ্বাসী, আধ্যাত্মিকতায়ও তিনি ছিলেন স্থিরপ্রত্যয়ী, মুক্তিসন্ধানী। ফররুখ আহমদ বলতেন, তিনি 'ডাহুক'কে নিঃসঙ্গ সাধকের জিকির এবং তার সাধনার সাফল্যের প্রতীক হিসাবেও ব্যবহার করেছেন। ডাহুক রাতভর ডাকতে-ডাকতে গলায় রক্ত তুলে ডিমে তা ছড়িয়ে দিয়ে উম দিলেই নাকি বাচ্চা ফোটে। সাধকের সাধনা এবং সাফল্যও অনেকটা ঐ রকমই।

ব্যবহারের স্বাতন্ত্র্য এবং তাৎপর্য যাই হোক, ফররুখ আহমদের কাব্যসাধনায় 'প্রতীক'-এর ব্যবহার একটি উল্লেখযোগ্য ব্যাপার। তিনি তার সনেটে এবং সনেট-

সিকোয়েন্সেও 'পাখির' প্রতীকে এ-যুগের যন্ত্রণা এবং গ্লানিবোধ ফুটিয়ে তুলেছেন, 'নদী'র প্রতীকে রূপায়িত করেছেন গতিময় জীবন ও আদর্শের উজ্জীবন। বস্তুত ফররুখ আহমদের বহু কবিতায় নদী-নিসর্গ এসেছে জীবনের প্রতিরূপ, এবং প্রাণ-সত্তা ও আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক আর উজ্জীবনী প্রেরণা হয়েই। শুধু খণ্ড কবিতায় এবং সনেটেই নয়, দীর্ঘ কবিতায় ও কাহিনী-কাব্যেও ফররুখ আহমদের কবিতায় রয়েছে রূপক ও প্রতীকের ব্যবহার। 'হাতেম-তায়ী' কাব্যে 'নুররেজ' ফুলের প্রতীকে বর্তমান সভ্যতার অন্ধত্ব ঘুচানোর পথ-নির্দেশ করেছেন তিনি। এ-কাব্যে প্রতীক ব্যবহৃত হয়েছে একাধিক ক্ষেত্রে।

[দুই]

'রূপক' ব্যবহারের কথা বিশেষভাবে বলতে গেলে, ফররুখ আহমদের বর্তমান কাব্যগ্রন্থ 'হাবেদা মরুর কাহিনী'র (যা কবির জীবদ্দশায় ছিল অপ্রকাশিত) উল্লেখ অনিবার্যভাবেই করতে হয়। খণ্ড কবিতায়, আখ্যান-কাব্যে এবং নাটকে ফররুক আহমদ নানাভাবে 'প্রতীক' ও রূপকের ব্যবহার ঘটিয়েছেন, কিন্তু সে সব ছন্দোবদ্ধ রচনায়ই ব্যবহৃত, গদ্যে কিংবা গদ্য-ছন্দের কবিতায় নয়। 'হাবেদা মরুর কাহিনী' শুধু রূপকাশ্রিত কাব্যই নয়, গদ্য-ছন্দে রচিত অনেকগুলি কবিতার সমষ্টি। খণ্ড কবিতা হলেও ভাব ও বক্তব্যের দিক থেকে পারস্পরিক অন্বয়ধর্মী ও অন্তরিত সম্পর্ক আছে এসব কবিতায়। বইয়ের পাণ্ডুলিপির 'ভূমিকায়' ফররুখ আহমদ লিখেছেন ঃ

> "রূপকথার 'হাবেদা মরুর' অন্য নাম হাওয়ার ময়দান। নিঃসীম শূন্যতা আর হতাশার ব্যঞ্জনা আছে ঐ মাঠের সাওয়ালে। 'হাবেদা মরুর কাহিনী' গদ্যে লেখা রূপক কবিতা : ঈসায়ী উনিশ শো' সাতান্নর শেষভাগে এই বইয়ের সূচনা আর উনিশ শো আটান্নর প্রথমার্ধে এর সমাপ্তি। ১৩৭৭ হিজরীর ঈদ-উল-আযহার দিনে এই বইয়ের শেষ কবিতা লেখা হয়। দুর্নীতি, অব্যবস্থা আর হতাশা যখন সারাদেশ ছেয়ে ফেলেছিল।" (কবির হাতে লেখা মূল পাণ্ডুলিপি থেকে)

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত এবং 'হায়াত দারাজ খান পাকিস্তানী' ছদ্মনামে সাপ্তাহিক 'আজ' পত্রিকায় প্রকাশিত ফররুখ আহমদের 'ঐতিহাসিক-অনৈতিহাসিক কাব্য' শীর্ষক ব্যঙ্গ-কাব্যেও তিনি ঐতিহাসিক চরিত্র মীর জাফরের জবানীতে তদানীন্তন শাসক-শোষক ও অন্যান্য সমাজবিরোধী 'নীতিবিদদের' তীব্র সমালোচনা করেছেন। আঠারো মাত্রার অক্ষরবৃত্ত ছন্দে ও প্রবহমান পয়ারে রচিত এই দীর্ঘ ব্যঙ্গ কাব্যটি পত্রিকায় প্রকাশের পর তাঁকে নাকি তদানীন্তন কর্তৃপক্ষীয় কেউ কেউ 'কম্যুনিস্ট কবি' বলে চিহ্নিত করার চেষ্টা করেছিলেন, এমন কি সে আমলে তাঁর বিরুদ্ধে পুলিশও নাকি লেলিয়ে দেয়া হয়েছিল।

তৎকালীন রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক অবস্থায় দুর্নীতি, অব্যবস্থা, আদর্শহীনতা আর হতাশা দেখে আদর্শবাদী ও সমাজ সচেতন এবং মানবতাবাদী কবি ফররুখ আহমদের

মন কতটা বেদনার্ত হয়েছিল, তার পরিচয় আছে 'হাবেদা মরুর কাহিনী'র অন্তর্গত রূপকাশ্রিত কবিতা গুচ্ছে।

একটি কবিতার উদ্ধৃতি থেকেই বিষয়টি স্পষ্ট হবে ঃ

মনে হয় বন্দী হয়ে আছি
ক্লেদ-পংকিল এক দুঃসহ বন্দীখানায়
(বাদগর্দ হাম্মানের মতই যা ভয়াবহ)
শান্তির চিহ্ন নাই যেখানে
শুধু মধ্যরাত্রে শোনা যায় শয়তানের অট্টহাসি
মানুষ বেঁচে আছে কিন্তু মুর্দার শামিল।
এদের চলা-ফেরা, ওঠা-বসা
সব কিছুই নিষ্প্রাণ,
জড় পদার্থের মত
ঠাণ্ডা,
অনুভূতিহীন।
বিদেশী মুসাফিরের যদি কেউ এখানে আসে
চমকে ওঠে। বলে ঃ এ কোন্ জমিনে এলাম ?
যদি কেউ বলে ঃ জিন্দেগানীর পথ
খোলা আছে এখনো
এরা তখন তাকায় বিকারের রোগীর মত
ঘোলাটে, আচ্ছন্ন দৃষ্টিতে
(হয়তো বিশ্বাস করে না)
কারণ সত্যিকার মুক্তির পথে
চায় নি কেউ এদের নিয়ে যেতে,
চেয়েছে কাহিনীর সেই প্রতারক হাজ্জামের মত
শুধু ভুলিয়ে রাখতে মিথ্যা প্রবঞ্চনায়।

জীবনকে এখন আমরা দেখছি
সেই অতন্দ্র রোগীর মত
রাত্রির দীর্ঘ প্রহর যার সামনে কেটে গেছে
স্বপ্নহীন আর শান্তিহীন,
ভোরের আলোকেও যে শুধু দেখছে
অন্ধকারের তিক্ত বিভীষিকা।

এই 'হাবেদা মরুর' প্রতীকে স্বদেশের তৎকালীন অবস্থাই যে বিধৃত তা বুঝে নিতে কষ্ট হওয়ার কথা নয়। কিন্তু রূপক ও প্রতীক-এর বৈশিষ্ট্যই এই যে, তা বিশেষ দেশ, সময় এবং বক্তব্যকে ধারণ করলেও গভীরতর ও ব্যাপকতর ব্যঞ্জনার কারণেই তা অর্জন করে অনেকটা সার্বজনীনতা। আসলে 'হাবেদা মরু' প্রাণহীনতা, রুক্ষতা, হতাশা, অন্ধকার এবং বিভীষিকারই প্রতীক এবং এ-কারণেই এর রূপকাশ্রিত উপস্থাপনাও ব্যাপকতর ও সার্বজনীন আবেদনের অধিকার রাখে।

ফররুখ আহমদ যেমন কীট্‌সের মতো 'পাখির' প্রতীকী ব্যবহার করেছেন, তেমনি তিনি টি, এস, এলিয়টের মতো 'হাবেদা মরুর কাহিনী'তে নিয়েছেন প্রতীক ও রূপকের আশ্রয়। এলিয়টের 'ওয়েস্ট ল্যান্ড' বা 'পোড়োজমি' 'ফাঁপা মানুষ' আধুনিক ইউরোপীয় সভ্যতার অবক্ষয়ের আর বন্ধ্যাত্বেরই প্রতীক। যদিও তিনি যুগ-সমস্যায় পীড়িত ও হতাশায় দীর্ণ মানুষকে ভবিষ্যতের আশা-আশ্বাসের বাণী শুনিয়েছেন উজ্জীবন ও মুক্তির পথ দেখিয়েছেন। আধুনিক সভ্যতার অবক্ষয়ী রূপ অংকন করতে গিয়ে টি, এস, এলিয়ট মৃত্যুর আতঙ্কে অস্থির ও হতাশার দীর্ণ মানুষকে অবলোকন করেছেন, আত্মার নিপীড়নে পর্যুদস্ত 'ফাঁপা' মানুষের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছেন–কিন্তু ক্ষণ-মুহূর্তের জন্যও হতাশাকে বরণ করে নেন নি। জীবনের প্রতি অনিঃশেষ আশাবাদ, দার্শনিক প্রজ্ঞা ও অভিজ্ঞান এবং সর্বোপরি মননশীল অনুপ্রাণনা তাঁকে জীবনের সঞ্জীবনী-উৎসের দিকে টেনে নিয়ে গেছে— বন্ধ্যাভূমিতেও তিনি মৌসুমী ফসলের প্রতীক্ষা করেছেন।

ফররুখ আহমদেও আছে অনিঃশেষ আশাবাদ এবং আদর্শ-উজ্জীবনের, নতুন সৃষ্টির আকাঙ্ক্ষা। 'হাবেদা মরুর' প্রতীকে এবং এই রুক্ষ ও প্রাণহীন ভূমির রূপকী উপস্থাপনায় স্বদেশের একটি বিশেষ সময়-সন্ধিক্ষণের হতাশাময় আলেখ্য ধরলেও আশাবাদী কবিকণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে বিশ্ব-শান্তির কথা, সর্বমানবের কল্যাণের আকাঙ্ক্ষা ঃ

যেন বঞ্চিত বনি আদমের এই দীর্ঘশ্বাস
রূপ নিতে পারে শান্তির প্রশ্বাসে,
যেন এই তৃষাতপ্ত হাবেদার মরু মাঠ
আবার হতে পারে
সুন্দর শান্তিময় মাটির জান্নাত
দুনিয়ার সকল মানুষের জন্যে
দুনিয়ার সকল মানবীর জন্যে।

ইসলামী আদর্শ, ঐতিহ্য ও মূল্যবোধের প্রতিষ্ঠা, এবং শোষণহীন সমাজ-ব্যবস্থা গড়ে তোলার মাধ্যমেই এটা সম্ভব, ঐতিহ্যবাদী ও মানবকল্যাণকামী কবি ফররুখ আহমদের এই গভীর এবং আন্তরিক বিশ্বাসও ভাষা পেয়েছে আলোচ্য কাব্যগ্রন্থে। প্রত্যক্ষভাবে যেমন, নানা প্রতীক এবং রূপকের মাধ্যমেও তা অভিব্যক্ত হয়েছে।

[তিন]

ফররুখ আহমদের কবিতায় প্রতীক ও রূপকের ব্যবহার যেমন বিশেষ উল্লেখযোগ্য ব্যাপার, তেমনি তাঁর রচনায় আঙ্গিকের পরীক্ষা-নিরীক্ষা, এবং ছন্দের বৈচিত্র্যময় ব্যবহারও বিশেষ উল্লেখনীয়, দৃষ্টি আকর্ষণ করার মতো। সৃজনধর্মী কবিরা আবেগ-অনুভূতি, স্বপ্ন-কল্পনা ফুটিয়ে তুলতে গিয়ে যেমন, বক্তব্য প্রকাশের জন্যও তেমনি নতুন ভাষা, ছন্দ, আঙ্গিক ইত্যাদি নির্মাণ করে নেন, নানাভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন। ছন্দ-নিপুণ এবং রূপদক্ষ কবি ফররুখ আহমদ ছন্দোবদ্ধ কবিতায়ও বৈচিত্র্য সৃষ্টি করেছেন, বিভিন্ন ধরনের ছন্দে এবং আঙ্গিকে রূপায়িত করেছেন তাঁর বক্তব্য, ভাবনা-বেদনা ও আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা। তাঁর কবিকর্মের বৃহত্তর অংশই ছন্দোবদ্ধ রচনা, এবং কাব্য-আঙ্গিক নির্ভর। কিছু কিছু গদ্যছন্দের কবিতা লিখলেও 'হাবেদা মরুর কাহিনী'ই একমাত্র গদ্য-কাব্য।

কবিতার ছন্দ নিয়ে ফররুখ আহমদের পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং তাঁর গদ্য কবিতা সম্পর্কে ইতিপূর্বের এক আলোচনায় লিখেছিলাম[১] 'অন্ত্যমিলযুক্ত ছন্দোধ্বনিময় কবিতা রচনাতেই ছিল তাঁর বিশেষ প্রবণতা। তাঁর গদ্য-কবিতা, মুক্তছন্দের কবিতা (ফ্রি-ভার্স) প্রায় নেই বললেই চলে। যতদূর জানি, তিনি ছদ্মনামে কিছু গদ্য কবিতা লিখেছিলেন।........... কবি জীবনের শুরুতে তিনি কোনো গদ্য-কবিতা কিংবা মুক্তছন্দের কবিতা লিখেছিলেন কিনা জানি না। তবে মাসিক 'সওগাত' পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর প্রথম কবিতাটি গদ্যছন্দে রচিত ঃ

মাধবী বিতানের পাশে তার ছায়া-বিতান।
তবু সে ফুটলো না মধুরাতে বসন্তের বিহ্বলতায়
সঙ্গী বসন্ত যেদিন লুটে পড়ল
        অন্তিম নিঃশ্বাসে, সেদিন
থেকেই বুঝি তার মনে সত্যিকারের
        অশ্রুর পরাগ জমতে
আরম্ভ করেছে। সঙ্গীহীনা সে এক কেতকী।

[আঁধারের স্বপ্ন]

১৩৪৫ সলের পৌষ সংখ্যা (১৯৩৮) 'সওগাত'-এ প্রকাশিত এই সুদীর্ঘ কবিতাটি গদ্য-ছন্দে রচিত এবং এতে কোনো 'পংক্তি-শেষের অন্ত্যমিল'ও নেই। কিন্তু কবিতাটির অনেক পংক্তিই সুনির্দিষ্ট ছন্দে, মাত্রায় ও পর্বে ভাগ করা যায়। যদিও সর্বত্র একই নিয়ম-রীতি এবং মাত্রা ও পর্বের অনুসরণ নেই। কবিতাটিতে শেষের

১. সাহিত্য ও সাহিত্যিক ঃ মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ, [পৃঃ ১৮৮-৮৯]

দিকে আশ্চর্যজনকভাবে পংক্তি-শেষের মিলও দু'য়েকটি এসে গেছে। এইসব স্তবক পুরোপুরি ছন্দে সমর্পিত ঃ

তোমার বুকের গন্ধে কখন ঘুমিয়ে ছিলাম একা
তোমার মনের কোণে,
পেলাম তোমার পাঁপড়ি দলে সবার অগোচরে
ছিলাম সঙ্গোপনে।
কোন্ সুদূরের স্বপন-মায়ার কাজল-ঘুমের মোহে
জানতে পারিনি তা
আজকে দেখি উঠছে ফুটে আমার মনের কোণে
তোমার মনোলিখা।
বাদল রাতে তোমার গীত অশ্রু রুধির ধারা
শুনছি জেগে একা,
আমার মনের গান যে মেশে তোমার মনের ছায়ে
মেলে মনের লেখা।

[আঁধারের স্বপ্ন]

এই কবিতার গদ্যাংশে ও পদ্যাংশে, কবির জীবনের প্রাথমিক-পর্বের রচনা বলেই, ভাষা ও রীতিভঙ্গীর দিক থেকে রাবীন্দ্রিক-প্রভাবের পরিচয়ও মেলে। কিন্তু কবিতায় এমন গদ্য ও পদ্যের পাশাপাশি সংস্থাপন ফররুখ আহমদের অন্য কোন কবিতায় রয়েছে কিনা, জানি না। তবে তাঁর বহু কবিতাতেই স্তবক বিশেষে ছন্দের বৈচিত্র্যময় প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। বিষয় ও বক্তব্যের চারিত্র্য অনুসারে, উচ্চারণের ভিন্নতার প্রয়োজনে, তিনি কবিতায় নানা ছন্দে ও স্তবক-বিন্যাস কৌশলের আশ্রয় নিয়েছেন, বিভিন্ন রূপের পারস্পরিক সন্নিবেশ ঘটিয়েছেন। কবিতায় আকস্মিকতা কিংবা নাটকীয়তার আশ্রয় তাঁর বহু কবিতায়ই অনুভবযোগ্য। পরিবেশ রচনা এবং পাঠকদের মানসিক প্রস্তুতির জন্যেই যেন তিনি কবিতায় মূল বক্তব্যের অবতারণার আগে এক ধরনের আকস্মিক-উন্মোচন ঘটিয়েছেন। 'হাবেদা মরুর কাহিনী' পড়তে গিয়েও এটা উপলব্ধি করা যাবে।

গদ্য-কাব্য তথা গদ্য-ছন্দের কবিতা রচনায় ফররুখ আহমদ কতটা সাফল্য অর্জন করেছেন তা ছান্দসিক-সমালোচক এবং সুধী পাঠকদের বিবেচনার বিষয়। তবে, গদ্য কবিতা তথা গদ্য-ছন্দের কবিতার চারিত্র্য সম্পর্কে কিছুটা আলোকপাত এই মূল্যায়নে সহায়ক হতে পারে। মনে রাখা দরকার যে, সাধারণ পাঠক অন্ত্যমিলকেই প্রধানত কবিতার ছন্দ বলে ধারণা করে থাকেন এবং অন্ত্যমিলবর্জিত হলেই, সাধারণভাবে কল্পিতা গদ্য কবিতা বলে গণ্য হয়। প্রথাগত রীতিতে মাত্রা, যতি, পর্ব ইত্যাদি অনুসৃত হলেও অন্ত্যমিল না থাকলে কবিতা 'গদ্য কবিতা' অভিধায় সাধারণত চিহ্নিত হয়।

কবিতার ছত্রান্তে, যে কোনো বর্ণের পারস্পরিক ধ্বনিগত মিলকেই, সেই সুদূর অতীতে কবিওয়ালার যুগে যেমন, একালেও তেমনি কবিত্ব শক্তির প্রকাশ হিসাবে সাধারণ্যে গণ্য করা হয়। কাব্যপাঠ ও উপভোগের এই ঐতিহ্যগত ধ্যান-ধারণা থেকেই সাম্প্রতিককালের পাঠক পর্যন্ত অন্ত্যমিলহীন ছন্দোবদ্ধ যে কোন কবিতাকেই গদ্য কবিতা হিসাবে গণ্য করতে কুণ্ঠিত হন না, তারা ভুলে যান যে, গদ্য কবিতারও এক ধরনের ছন্দ এবং ছন্দস্পন্দ রয়েছে, আর ছন্দ-নিপুণ কবি ছাড়া সার্থক গদ্য-কবিতা লেখাও সম্ভব নয়।

সুনির্দিষ্ট নিয়ম-রীতির অধীনে ছন্দোবদ্ধ কবিতা রচনার ক্ষেত্রে মাত্রা, যতি, পর্ব ইত্যাদি অনেকটা প্রথাবদ্ধরীতিতে মেনে নিয়ে অগ্রসর হতে হয়, এবং সেক্ষেত্রে সামান্যতম বিচ্যুতিকেও ছান্দসিকেরা ছাড়পত্র দিতে চান না ; কিন্তু 'ফ্রি-ভার্স' বা গদ্য-কবিতা রচনার সুবিধা এই যে তাতে ঐসব ক্ষেত্রে বেশ কিছুটা স্বাধীনতা নেয়া চলে ; ফ্রি-ভার্সের প্রতি কবিদের ঝোঁকের উৎস সম্ভবত এটাই। ফররুখ আহমদও সম্ভবত বক্তব্য প্রকাশের সুবিধার জন্যেই 'হাবেদা মরুর কাহিনী'তে এই স্বাধীনতা নিয়েছেন, অবলম্বন করেছেন গদ্যছন্দ। ছন্দোবদ্ধ রচনার একঘেঁয়েমি পরিহার করার, এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রয়োজনেও হয়তো তিনি এই রীতি অবলম্বন করে থাকবেন। হতাশা, জীবনের রুক্ষতা এবং প্রাণহীনতার প্রতীকায়ন আর রূপকাশ্রিত উপস্থাপনাই যেখানে লক্ষ্য, সেখানে নিরেট গদ্যছন্দ অবলম্বন এবং আবেগ-রহিত, লাবণ্যহীন ভাষা ব্যবহার, অস্বাভাবিক কিংবা বিচিত্র কিছু নয়।

অবশ্য 'বহিরাচারী ছন্দমাপকে' বর্জন করলেও, গদ্য কবিতায়ও শব্দের অন্তরাশ্রয়ী যে ছন্দ এবং পরস্পর বন্ধনে যার দ্যোতনা—সেই ছন্দকে বর্জন করা সম্ভব নয়, এবং বর্জন করলে, করতে গেলে, কাব্যছন্দের মুক্তি তো দূরের কথা, কাব্য সৃষ্টি হওয়াই অসম্ভব। কারণ প্রচলিত ছন্দের চারিত্র্য এবং পরিমাপ অনুসরণ না করলেও, প্রত্যেকটি শব্দের এবং সে সবের ধ্বনিগত পরস্পর বন্ধনের যে একটি ধ্বনিগত সুসাম্য, মিল এবং দ্যোতনা আছে এ-সম্পর্কিত সচেতনতা মুক্তছন্দের অনুসারী কবির জন্যেও অপরিহার্য। 'হাবেদা মরুর কাহিনী'তে যখন আমরা পড়ি,

কিন্তু এখানে
এখানে এই অমিল, ছন্দহীন প্রাণের পৃথিবীতে
কাঁকর-বিছানো মাঠে
বালুরুক্ষ বিয়াবানে
আমাদের দিন কেটে যায়
হাবেদা মরুর মাঠের
বাতাসের দীর্ঘশ্বাস শুনে

তখন অন্ত্যমিলহীন, এই গদ্য-উচ্চারণও মনে ছন্দের দ্যোতনা জাগায়। মুক্তছন্দের কবিতা রচনার ক্ষেত্রেও শব্দ-নির্বাচনের ব্যাপারে অমনোযোগ কিংবা অসতর্কতা কবিতার সুশৃঙ্খল অন্তর-প্রকৃতিকে ক্ষুণ্ন করতে পারে। কারণ, গদ্য কবিতার ছন্দ যদিও সুদির্দিষ্ট কিংবা নিরুপিত ছন্দ নয়, তাহলেও ছন্দস্পন্দ (রিদম) এবং যাকে বলা যেতে পারে ছন্দের অন্তপ্রবাহ কিংবা চোরাস্রোত, তা ও শব্দ-নির্বাচনের এই অসতর্কতা ও অমনোযোগের কারণে বিশেষভাবে ব্যাহত হবার সম্ভাবনা থেকে যায়। ফররুখ আহমদের মতো শব্দ-সচেতন, ভাষা-ব্যবহারে দক্ষ কবির ক্ষেত্রেও যে এমনটি না ঘটেছে, এমন নয়। 'হাবেদা মরুর কাহিনী'তেও তিনি বক্তব্য প্রকাশের অবারণ ঝোঁকে অনেক অ-কাব্যিক ও নিতান্ত গদ্যাত্মক শব্দ ব্যবহার করেছেন। কবির বদলে হয়ে উঠেছেন বক্তা। যিনি লিখেছেন এমন অনুপম আকর্ষণীয় স্তবক ঃ

বিষণ্ন সন্ধ্যার অস্পষ্ট আলোকে
কাল জেগে উঠেছিল
এক মজানদীর কাহিনী
(উচ্ছল পারার মত আকাশের সেই আর্শি—
মুখ দেখতো যাতে
সংখ্যাহীন তারা আর চাঁদ,
পাল তুলে যেত দূরের নৌকা
উদ্দাম স্রোতে ভাসমান রাজহাঁসের মত
সে নদী এখন গেছে শুকিয়ে,
তার বালুবক্ষে এখন ঘুরে বেড়ায়
তপ্ত হাওয়ার শ্বাসে
বহু যুগ আগেকার এক বিগত দিনের কান্না)
আর মনে হয়েছিল
এখনো সে নদী পারে বাঁচতে
এখনো সে পারে ফিরে পেতে
তার বহমান তরঙ্গ
উদ্দাম গতিবেগ
প্রবল প্রাণোচ্ছ্বাস ;
যদি সে খুঁজে পায়
শুধু তার মূলের ঠিকানা।

তিনিই সকল রূপক, প্রতীক ও কাব্যের আড়াল ছিন্ন করে আত্মসমালোচনার আঘাত হেনে একেবারেই গদ্যাত্মক ও অ-কাব্যিক ভাষায় বলেছেন এই উপলব্ধির কথা ঃ

যেদিন থেকে আমরা নিয়েছি
ঈমানের পরিবর্তে বে-ঈমানী
একতার পরিবর্তে অনৈক্য,
আর শৃঙ্খলার পরিবর্তে বিশৃঙ্খলা
(কদর্য উচ্ছৃঙ্খলতা)
শুধু হয়েছে সেদিন থেকেই
আমাদের চূড়ান্ত দুর্গতি।

মনে রাখতে হবে, 'ফ্রি-ভার্স' বা গদ্য-কবিতায় ব্যবহৃত শব্দাবলী গদ্যাত্মক হয়েও থাকে অনেকখানি কাব্যধর্মী এবং এই চারিত্র্যের কারণেই উল্লিখিত বিশেষ রীতির কবিতা 'গদ্য-কবিতা' এই অভিধায় চিহ্নিত। ছন্দোবদ্ধ এবং পদ্যবন্ধের কবিতায় যে-ধরনের শব্দ-নির্বাচিত ও ব্যবহৃত হয়, অনিবার্য কারণেই তার কিছুটা অলংকৃত ও প্রসাধিত চারিত্র্য থাকে– থাকে কাব্যগন্ধী লাবণ্যের ছটা। ফররুখ আহমদের ছন্দোবদ্ধ এবং অন্ত্যমিলযুক্ত কবিতায় কবিত্বময় ইমেজোচ্ছল ভাষার উজ্জ্বল পরিচয় আছে। 'সিন্দাবাদ' প্রতীকে তিনি যখন উচ্চারণ করেন ঃ

কেটেছে রঙিন মখমল দিন, নতুন সফর আজ,
শুনছি আবার নোনা দরিয়ার ডাক,
ভাসে জোরওয়ার মাউজের শিরে
সফেদ চাঁদির তাজ
পাহাড় বুলন্দ ঢেউ বয়ে আনে নোনা
দরিয়ার ডাক ;
নতুন পানিতে সফর এবার, হে মাঝি সিন্দাবাদ।

সমুদ্র থেকে সমুদ্রে ঘোরে দরিয়ার সাদা তাজী !
খুরের খল্‌কা—ধারালো দাঁড়ের আঘাতে ফুলকি জ্বলে,
সমুদ্র থেকে সমুদ্রে ঘোরে দরিয়ার সাদা তাজী
তুফানের মাঠ পাড়ি দেওয়া তার একী দুরন্ত নেশা।

তখন বলিষ্ঠ ও সৌন্দর্যদীপ্ত ভাষার বন্ধনে এবং ছন্দ-ধ্বনিময় বাকপ্রতিমার এক অনুপম আলেখ্যই অঙ্কিত হয়, বাঙময় হয়ে উঠে। নিরুপিত ও সুনির্দ্দিষ্ট ছন্দে এ-ধরনের কাব্যগন্ধী, লাবণ্যময় এবং বলিষ্ঠ ও সৌন্দর্য-দীপ্ত ভাষা ব্যবহার অপেক্ষাকৃত সহজ এবং বিধিবদ্ধ কিন্তু গদ্য-কবিতায় শব্দ নির্বাচন ও ভাষা-ব্যবহারের প্রশ্নে এমন রীতিবদ্ধতা অপরিহার্য নয়, এ কারণেই গদ্য-কবিতায় শব্দ-নির্বাচন ও ব্যবহারের স্বাধীনতা কিছুটা বেশি। কিন্তু তবুও যেহেতু গদ্য-কবিতা মূলত কবিতাই, এবং ভাষার ক্ষেত্রে ঘরোয়া আলাপচারী ভঙ্গী ব্যবহারের অবকাশ এতে বেশি, আর গদ্য হলেও, এই

কবিতায়ও ছন্দের চোরাপ্রবাহ রয়েছে, সে কারণে সাধারণত ছন্দ-নিপুণ কবির হাতেই গদ্য-কবিতাও প্রাণবান এবং সজীব হয়ে উঠে। রবীন্দ্রনাথ থেকে শুরু করে একালের অনেক আধুনিক কবির রচনায়ই এর পরিচয় আছে।

সুধীন্দ্রনাথ দত্তের ভাষায় বলতে গেলে, কবিতার ভাষার যে 'অভব্য বস্তুতন্ত্র' তাতেও ছন্দঃস্রোত প্রবাহিত; এবং শব্দের 'ক্যাডেন্স' অর্থাৎ স্বরপ্রবাহ মূলত বক্তব্যের ও সে অনুসারে উচ্চারণের প্রকৃতি অনুযায়ী ধ্বনিত। অনিরূপিত ছন্দোবদ্ধ কবিতায় শব্দের এই ক্যাডেন্স অর্থাৎ স্বরপ্রবাহ প্রাধান্য পায় না, কারণ সেখানে মাত্রানুযায়ী শব্দ উচ্চারিত হয় বলে এবং ভাবযতি অনুসারে ছেদ পড়ে বলে, পূর্ণ এবং অপূর্ণ পর্বে ছন্দই প্রাধান্য বিস্তার করে রাখে ; কিন্তু গদ্য-ছন্দের কবিতায় শব্দের ক্যাডেন্স বা স্বরপ্রবাহই অধিক গুরুতপূর্ণ। কারণ, গদ্যছন্দের প্রকৃতি অনেকখানি অন্তর্নিহিত। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় ঃ "গদ্যই হোক পদ্যই হোক, রসরচনা মাত্রেরই একটি স্বাভাবিক ছন্দ থাকে। পদ্যে সেটা সুপ্রত্যক্ষ, পদ্যে সেটা অন্তর্নিহিত। সেই নিগূঢ় ছন্দটিকে পীড়ন করলেই কাব্যকে আহত করা হয়। পদ্যছন্দ বোধের চর্চা বাঁধা নিয়মের পথে চলতে পারে, কিন্তু গদ্যছন্দের পরিমাপ বোধ মনের মধ্যে যদি সহজে না থাকে অলংকার-শাস্ত্রের সাহায্যে এর দুর্গমতা পার হওয়া যায় না। অথচ অনেকেই মনে রাখে না যে, যেহেতু গদ্য সহজ সে কারণেই গদ্যছন্দ সহজ নয়।"

ফররুখ আহমদ তাঁর কবি-জীবনের বৃহত্তর অংশই ব্যয় করেছেন পদ্যছন্দের চর্চায় এবং এ ক্ষেত্রে তিনি রেখেছেন দক্ষতা ও সাফল্যের স্বাক্ষর। শুধু ছন্দের বিভিন্নরূপ এবং বৈচিত্র্যধর্মী ব্যবহারেই নয়, কবিতার অন্ত্যমিলেও এই দক্ষতা এবং সাফল্যের স্বাক্ষর আছে। গদ্যকাব্য আলোচ্য 'হাবেদা মরুর কাহিনী'তে তিনি ছন্দের প্রথাবদ্ধ রীতি এবং মনোটনি অর্থাৎ একঘেঁয়েমি ভেঙেছেন। তিনি যখন উচ্চারণ করেন ঃ

কাফেলা এসে দাঁড়ালো
হাওয়ার মাঠ দশ্‌তে হাবেদায়........
জিন্দেগীর সবুজ নিশানা হারিয়ে
খা খা করছে যেখানে দিগন্ত ছোঁয়া ময়দান,
যেখানে পোড়া মাটি রঙ ফসলের শূন্য মাঠ
বাতাসের দীর্ঘশ্বাসে গুমরে উঠছে রাত্রিদিন

কাফেলা এসে দাঁড়ালো সেই রুক্ষ বিয়াবানে
সবচেয়ে প্রাণবন্ত চারা গাছ
যে মাটিতে মাথা তুলে
কুঁকড়ে শুকিয়ে মারা গেছে
যে মরা গাছের শুকনো ডালে দেখেছি
ঝড়ো সন্ধ্যায় হিংস্র জ্বীনের নর্তন।

তখন এই গদ্য কবিতায়ও স্বরপ্রবাহ, ধ্বনি দ্যোতনা এবং ছন্দের চোরা-স্রোত অনুভব করা যায়। কিছু কিছু শব্দের স্থানান্তর ঘটিয়ে, দু'য়েকটি শব্দ সংযোজনের মাধ্যমে এবং যতি, মাত্রা, পর্ব ইত্যাদির নব-বিন্যাসে এই গদ্যাংশকেও রূপান্তরিত করা যায় পদ্য-ছন্দে। যেমন ঃ

কাফেলা দাঁড়ালো এসে। সেই
অচেনা হাওয়ার মাঠ। দশ্‌তে হাবেদায়.........
জিন্দেগীর। সবুজ নিশানা যত। হারিয়ে সুদূরে
খা খা করছে আজ। যেখানে দিগন্ত ছোঁয়া। ময়দান
যেখানে রয়েছে যত। পোড়া মাটি রঙ আর।
ফসলের। ঢের শূন্য। মাঠ
বাতাসের দীর্ঘশ্বাসে। গুমরে উঠছে কেঁদে।
শুনি রাত্রিদিন।

ভাষা ও ছন্দের সুদক্ষ রূপকার ফররুখ আহমদ যদি গদ্যছন্দে না লিখে, পদ্যছন্দে লিখতে চাইতেন, তাহলে উপরোক্ত কাব্যাংশ হয় তো অনেক বেশি প্রাণবান, সজীব এবং আকর্ষণীয় হয়ে উঠতো। শুধু ফররুখ আহমদেরই নয়, যে-কোনো প্রতিভাবান এবং ভাষা ও ছন্দের দক্ষ রূপকার কবির হাতেই তেমন সৃষ্টি সম্ভব হতে পারে। কেননা, গদ্যছন্দে রচিত হলেও, উপরোক্ত রচনাংশে একটা স্বাভাবিক ছন্দ আছে, আর এটা সম্ভব হয়েছে এ-কারণে যে, পদ্যছন্দের দক্ষ রূপকার ফররুখ আহমদের মনের মধ্যেও গদ্যছন্দের পরিমাপ বোধ ছিল, আর এটাও মনে রাখা দরকার যে, 'গদ্য কিংবা পদ্য' যা-ই হোক না কেন, ভাষামাত্রেরই যে একটা স্বাভাবিক ছন্দ আছে, এই বোধ যার নেই, তার পক্ষে 'অলংকার শাস্ত্রের' সহায়তায় কোনো ছন্দই যথার্থরূপে আয়ত্তে আনা সম্ভব নয়। ভাষার এই স্বাভাবিক ধ্বনিপ্রবাহ এবং ছন্দোময়তা সম্পর্কে সচেতনতাই মাত্র ভাষার ব্যবহারকারীকে এর বৈচিত্র্যময় ছন্দ এবং ছন্দোপ্রকৃতি আবিষ্কারে সহায়তা করতে পারে। এমন সহায়তা পেয়েছেন বলেই, ফররুখ আহমদ গদ্যছন্দেও অসফল হননি; বস্তুত, 'হাবেদা মরুর কাহিনী'-তে তাঁর সাফল্য, কবির অন্যান্য কাব্যের তুলনায় ন্যূন হলেও, একটি রূপকাশ্রিত গদ্যকাব্য হিসাবে এ ফররুখ আহমদের এক উল্লেখ-যোগ্য রচনা।

মোহাম্মদ মাহ্‌ফুজউল্লাহ্

রূপকথার 'হাবেদা মরুর' অন্য নাম 'হাওয়ার ময়দান'। নিঃসীম শূন্যতা আর হতাশার ব্যঞ্জনা আছে ঐ মাঠের সাওয়ালে।

'হাবেদা মরুর কাহিনী'—গদ্যে লেখা রূপক কবিতা। ঈসায়ী উনিশ শো সাতান্নর শেষ ভাগে এই বইয়ের সূচনা আর উনিশ শো আটান্ন'র প্রথমার্ধে এর সমাপ্তি। ১৩৭৭ হিজরীর ঈদ-উল আজহার দিনে এই বইয়ের শেষ কবিতাটি লেখা হয়। দুর্নীতি, অব্যবস্থা আর হতাশা যখন সারা দেশ ছেয়ে ফেলেছিল। আর সেই মারাত্মক নৈরাজ্যের মুখে যখন প্রত্যেক দেশাত্মবোধ সম্পন্ন নাগরিক কামনা করেছিলেন একটি বৈপ্লবিক পরিবর্তনের।

ফররুখ আহমদ

এক

জুল্‌মাতের হিংস্র ছায়ায়
মিশে গেছে কাহিনী শোনার সন্ধ্যা...
কিন্তু এখানে,
এখানে এই অমিল ছন্দহীন প্রাণের পৃথিবীতে,
কাঁকর-বিছানো মাঠে,
বালু-রুক্ষ বিয়াবানে
আমাদের দিন কেটে যায়
হাবেদা মরু মাঠের
বাতাসের দীর্ঘশ্বাস শুনে...

যে বাতাসে মিশে আছে
অসংখ্য বঞ্চিত প্রাণের আকুতি,
যে বাতাসে মিশে আছে
বেশুমার ইন্‌সানের আহাজারি;
যে বাতাসে মিশে আছে
সেই বৃদ্ধ জয়ীফের কণ্ঠ
আর অভিযাত্রী কাফেলার
বহু ব্যর্থতার কাহিনী
(যা শুধু আমরা কানেই শুনেছি
দেখিনি কখনো দু'চোখে)।

দুই

কাফেলা এসে দাঁড়ালো
হাওয়ার মাঠ দশ্‌তে হাবেদায়...
জিন্দেগীর সবুজ নিশানা হারিয়ে
খা খা করছে যেখানে দিগন্ত-ছোঁওয়া ময়দান,
যেখানে পোড়া-মাটি-রঙ ফসলের শূন্য মাঠ
বাতাসের দীর্ঘশ্বাসে গুম্‌রে উঠ্‌ছে রাত্রি দিন...

কাফেলা এসে দাঁড়ালো সেই রুক্ষ বিয়াবানে,
সব চেয়ে প্রাণবন্ত চারা গাছ
যে মাটিতে মাথা তুলে
কুঁকড়ে শুকিয়ে মারা গেছে
(যে মরা গাছের শুক্‌নো ডালে দেখেছি
ঝড়ো সন্ধ্যায় হিংস্র জ্বীনের নর্তন...........)

সব চেয়ে বলিষ্ঠ বুক
আর জোরালো ডানার পাখী
যে প্রান্তর পার হওয়ার পথে
ডানা গুটিয়ে হঠাৎ পড়ে গেছে মুখ থুবড়ে
আজ্‌দাহার তীব্র দৃষ্টিতে সম্মোহিত শিকারের মত
(তারপর কোন দিন-ই যার সাড়া পাওয়া যায়নি)।

কাফেলা এসে দাঁড়ালো
হাবেদার সেই মৃত্যু-হিংস্র প্রান্তরে
(এক দিকে যার ক্ষুব্ধ কহর দরিয়া
অন্য দিকে লুব্ধ বাদগর্দ হাম্মাম,
জেগে আছে দুই ধ্বংসের
দুই অপমৃত্যুর ইশারা নিয়ে).........

এক অজানা ভয়ে কেঁপে উঠলো সবারমন
আসন্ন মৃত্যুর আভাষে,
কেঁপে উঠলো কাফেলা-সালার
সেই দীর্ঘশ্বাসের প্রান্তরে,
হাওয়ার মাঠ দশ্‌তে হাবেদার
তপ্ত তামার মত ময়দানে.....

তিন

এ এক কঠিন পরিস্থিতি........

জওয়াব দিতে না পারলে
জিন্দেগীর সাত সওয়ালের
এখানে নাই মুক্তির কোন সম্ভাবনা।

এই লক্ষ্যহীন জীবন,
এই পাওয়া না পাওয়ার দ্বন্দ্ব,
এই দীর্ঘশ্বাসের প্রান্তর ;
এ সব-ই এক বিস্বাদ ব্যর্থতার পটভূমি।
এরপর আসবে
আতশী দরিয়া,
কহর দরিয়া,
রক্ত সমুদ্র
আর কোকাফের কাল পাথরের মত
ঘন অন্ধকার রাত্রি...........

অতিক্রম করতে না পারলে
সকল বাধা—সব প্রতিবন্ধক,
উত্তর দিতে না পারলে
জীবনের সকল প্রশ্নের,
ব্যর্থতার ক্লান্ত শ্বাস
শুধু বয়ে আনবে এখানে
এক মৃত্যু ঝড়ের ইশারা !

চার

এ কথা আমি ভেবেছি
কহরমা দরিয়া-যাত্রী মুসাফিরের মত
রাত্রির হিংস্র সমুদ্র তীরে দাঁড়িয়ে
(যখন দিগন্তচারী আদম সূরাত
আসমানের বাঁকা পথ পাড়ি দিয়ে
মিশে গেছে দূরান্তে,
আর মুশতারি, সূরাইয়া ডুবে গেছে আমার অলক্ষ্যে)।

কাহিনীর অস্পষ্ট অন্ধকার থেকে
তারপর আমার দৃষ্টি নেমে এসেছে
এক অচেনা দিনের ময়দানে,
আর সেখানেও আমি শুনেছি
বাতাসের একটানা দীর্ঘশ্বাসে,
দুনিয়ার সকল কান্নার মিলিত আওয়াজ।
ছুটে এসেছি আমি তখন তিক্ত বেদনায়,
ঘুরেছি দিশাহারা মানুষের সঙ্গে
পথ ছেড়ে প্রান্তরে
(অনেক কাঁকর বিছানো মাঠে
অনেক বালু-রুক্ষ বিয়াবানে)
কিন্তু শূন্যতাই দেখেছি সম্মুখে ;
ব্যর্থতার বোঝা-ই শুধু বাড়িয়েছি সকলে।

সাত সওয়ালের মত
যে করতে পারবে
এ মাঠের সাত সমস্যার সমাধান,
জাগাতে পারবে যে এই মরা মাঠে
জিন্দেগীর নতুন আশা,
সে-ই শুধু পারবে থামাতে এই দীর্ঘশ্বাস ;
সে-ই শুধু পারবে থামিয়ে দিতে
বাতাসের এই করুণ কান্না।

কিন্তু কোথায় সেই স্থির লক্ষ্য কামিল ইন্‌সান
আর কোথায় সেই নাজাতের রাহা ?

পাঁচ

মনে হয় বন্ধ হ'য়ে আছি
ক্লেদ-পংকিল এক দুঃসহ বন্দীখানায়
(বাদগর্দ হাম্মামের মতই যা ভয়াবহ)।
শান্তির চিহ্ন নাই যেখানে
শুধু মধ্য রাত্রে শোনা যায় শয়তানের অট্টহাসি।
মানুষ বেঁচে আছে
কিন্তু মুর্দার শামিল !
এদের চলা-ফেরা, ওঠা-বসা
সব কিছুই নিষ্প্রাণ ;
জড় পদার্থের মত
ঠাণ্ডা,
অনুভূতিহীন !

বিদেশী মুসাফিরের যদি কেউ এখানে আসে
চমকে ! বলে ঃ এ কোন্ জমিনে এলাম ?
যদি কেউ বলে ঃ জিন্দেগানীর পথ
খোলা আছে এখনো।
এরা তখন তাকায় বিকারের রোগীর মত
ঘোলাটে, আচ্ছন্ন দৃষ্টিতে
(হয়তো বিশ্বাস করে না)।

কারণ সত্যিকার মুক্তির পথে
চায়নি কেউ এদের নিয়ে যেতে,
চেয়েছে কাহিনীর সেই প্রতারক হাজ্জামের মত
শুধু ভুলিয়ে রাখতে মিথ্যা প্রবঞ্চনায়।

ছয়

জীবনকে এখন আমরা দেখ্‌ছি
সেই অতন্দ্র রোগীর মত
রাত্রির দীর্ঘ প্রহর যার সামনে কেটে গেছে
স্বপ্নহীন আর শান্তিহীন,
ভোরের আলোকেও যে শুধু দেখছে
অন্ধকারের তিক্ত বিভীষিকা।

সাত

চোখের সামনে ঘুরে যাচ্ছে পাক খেয়ে
দিনের পর দিন
মাসের পর মাস,
বৎসরের পর বৎসর
(সময়ের ছক কাটা পথে
ধরা ছোঁওয়ার বাইরে থেকে
এক খরস্রোতা প্রবাহের মত) ;
কিন্তু আমাদের নিম্নগতি
উর্দ্ধমুখী হচ্ছেনা আর কিছুতেই।
আঁস্তাকুড়-মুখী শকুনের দৃষ্টি
কিছুতেই আর ফিরছে না ঊর্ধ আকাশের দিকে।

অন্যের দোষ দিয়ে লাভ নাই কোন
কারণ আমরাই ঘুরিয়েছি আমাদের দৃষ্টি
পাহাড়ের সবচেয়ে উঁচু তলা থেকে
পাতালের সবচেয়ে নীচু নর্দমায় ;
আর আত্মপ্রতারণার অভিশপ্ত জাহান্নামে
আর্তস্বর তুল্‌ছি প্রতি মুহূর্তে
এখানে—হাবেদার মত এই ব্যর্থতার মাঠে
বিষ-তিক্ত এই দীর্ঘশ্বাসের প্রান্তরে।

আট

দুর্ভিক্ষ আর মড়কের দিনে
যতবার আমি শুনেছি ক্ষুধিত শিশুর কান্না
ততবার তাকিয়েছি ক্লান্ত বিষণ্ন দৃষ্টিতে,
কিন্তু আমার ধূসর দিগন্তে
কোন দিন-ই পড়েনি
সেই বিশাল দেহ নেতার ছায়া
দুর্গত মানুষের খাদ্যের সামান বইতে
যার পিঠ বেঁকে পড়েছে
বিপুল বোঝার ভারে।

অস্পষ্ট আলো অন্ধকারে
যতবার আমি শুনেছি
গৃহ-হারা নারীর সাহায্য ভিক্ষা
ততবার আমি তাকিয়েছি ম্লান, অসহায় দৃষ্টিতে,
কিন্তু আমার ধূসর দিগন্তে
কোন দিন-ই পড়েনি
সেই মহীয়সী মহিলার ছায়া
দুর্গত মানবতার সেবায়
এগিয়ে এসেছে যাঁর দু'খানা হাত
অনাড়ম্বর, অকৃপণ মমতায়।

সূচীভেদ্য রাত্রির অন্ধকারে
যতবার আমি দেখেছি
পাপ-লুব্ধ পিশাচের নির্লজ্জ পৈশাচিকতা,
ততবার আমি তাকিয়েছি শংকিত, ব্যথাতুর দৃষ্টিতে,
কিন্তু কোন দিন-ই আমার নজরে পড়েনি
দোররা-ধারী সেই শক্তিমান খলিফার চেহারা
প্রাণ-প্রিয় পুত্রের রক্তাক্ত দেহ
যাকে নিবৃত্ত করতে পারেনি
পক্ষপাতহীন বিচার
মৃত্যু-কঠিন শাস্তি থেকে।

নয়

স্বস্তিহীন,
শান্তিহীন,
এই দুর্ভিক্ষ মড়কের দেশে
অসংখ্য, অগণিত প্রাণ
সঁপে দিয়ে অকাল মৃত্যুর মুখে
খুঁজে বেড়াচ্ছি নিকষ অন্ধকারে
মূল কারণ সেই অপমৃত্যুর।
দূরদর্শীর ভান করছি আমরা সকলেই,
শুধু দেখছিনা কাছের পাপগুলোকে,
দেখছিনা দুর্নীতির কত পুঁতিগন্ধময় অন্ধকার
ছেয়ে ফেলেছে আমাদের নির্জীব সমাজ সত্তা......

যে দুর্নীতির অভিশাপ
জেগে আছে কদর্য পিশাচের মত
আদর্শহীন জীবনের সহস্র ফাটলে !
যে দুর্নীতির বিষ
পড়েছে ছড়িয়ে
দুরারোগ্য যক্ষ্মা বীজাণুর মত
সমাজদেহের শিরায় ধমনীতে,
যে দুর্নীতির বিষাক্ত দহনে
এ দেশের মাটিতে, হাওয়ায়
জেগেছে তীব্র হাভিয়ার জ্বালা
(জেগেছে এক অপরিমাণ শূন্যতা).......

বুঝেও আমরা কিছুই পারছি না বুঝতে
জেনেও শুধু করছি না জানার ভান,
আর অন্ধের মত নিকষ রাত্রির চোরা গলিতে
ঘুরে মরছি মুক্ত আলোর
পূর্ণ জীবনের সন্ধানে.......

দশ

বিষণ্ন সন্ধ্যার অস্পষ্ট আলোকে
কাল জেগে উঠেছিল
এক মজা নদীর কাহিনী
(উচ্ছল পারার মত আকাশের সেই আরশি-
মুখ দেখতো যাতে
সংখ্যাহীন তারা আর চাঁদ,
পাল তুলে যেতো দূরের নৌকা
উদ্দাম স্রোতে ভাসমান রাজহাঁসের মত ;
সে নদী এখন গেছে শুকিয়ে !
তার বালু-বক্ষে এখন ঘুরে বেড়ায়
তপ্ত হাওয়ার শ্বাসে
বহু যুগ আগের এক বিগত দিনের কান্না)

আর মনে হয়েছিল
এখনো সে নদী পারে বাঁচতে
এখনো সে পারে ফিরে পেতে
তার বহমান তরঙ্গ
উদ্দাম গতিবেগ, প্রবল প্রাণোচ্ছ্বাস ;
যদি সে খুঁজে পায়
শুধু তার মূলের ঠিকানা।

এগারো

তখন আমার স্বপ্ন মনে হয়নি
যখন ভেসে উঠেছিল আমার চোখের সামনে
এক শান্তি-সেনার বাহিনী,
এক নির্ভীক মাল্লার দল ;
একদল আদর্শবাদী সমাজ-কর্মী
আর একদল সর্বত্যাগী সূফী দরবেশ।

আমি দেখতে পেলাম
সারা দুনিয়ার মানুষ
খোশ আমদেদ জানাচ্ছে
মুক্তির সনদ পাওয়া
খিলাফতের সেই সব আদর্শ নাগরিককে।

আমি দেখতে পেলাম
সারা দুনিয়ার জন-সমর্থনেই
তাদের সেনাবাহিনী পার হয়ে গেল
অশান্তির সকল প্রান্তর,

তাদের ঘোড়ার খুরে জাগলো
মরুভূমির সকল ঘুমন্ত হলকা,
তাদের প্রশ্বাসে আগুন রঙে রাঙলো
রাত্রিশেষে জড়তার আস্‌মান,
তারা শেষ করে দিল জালিমের, জুলুমের
অসত্যের, অশান্তির দিন।

তাদের মাঝিমাল্লা পাড়ি দিল সকল দরিয়া,
তাদের দাঁড়ের মুখে জাগলো
নোনা পানির অশ্রু সমুদ্রে
আশার স্ফুলিঙ্গ,
তারা নিয়ে গেল মেশ্‌ক, আম্বর,
—শান্তি, মৈত্রী, মুহব্বতের সওগাত
সকল অনাবিষ্কৃত দ্বীপে ;
সকল অনাবাদী দেশে।

তাদের শিক্ষার্থী, শিক্ষক
আহরণ করল বিশ্বের জ্ঞান,
আর ছড়িয়ে দিল
সেই ভাণ্ডারের ইয়াকুত, পোখরাজ, লাল, জওয়াহের
সারা দুনিয়ার বুকে।

তাদের সর্বত্যাগী সূফী, দরবেশ
প্রচার করল সারা দুনিয়ায়
এক সত্য ধর্মের মহিমা,
জুলমাতের ঘন অন্ধকারে
তারা আনলো তৌহিদী আলোর দীপ্ত মশাল,
আর প্রতিষ্ঠা করল
অন্যায়–অবিচার–শোষণ–ত্রাসন-মুক্ত
আদম সন্তানের এক বিশ্ব ভ্রাতৃ-সমাজ।

এ সব-ই আমার কাছে সত্য বলে মনে হয়েছিল
যখন একের পর এক খুলে যাচ্ছিল দৃশ্যের পর দৃশ্য !
কিন্তু যখন আমার ঘুম ভেঙে গেল
তখন আমার মনে হল
ঃ যা দেখেছি তার সব কিছুই স্বপ্ন,
বহুদিন আগেকার
এক বিস্মৃত যুগের হারানো কাহিনী।

বারো

যে দিন থেকে আমরা নিয়েছি
ঈমানের পরিবর্তে বে-ঈমানী,
একতার পরিবর্তে অনৈক্য,
আর শৃঙ্খলার পরিবর্তে বিশৃঙ্খলা (কদর্য উচ্ছৃঙ্খলতা)
শুরু হয়েছে সে দিন থেকেই
আমাদের চূড়ান্ত দুর্গতি,
সে দিন থেকেই আমাদের অগ্রগতি
হয়েছে পরিপূর্ণভাবে ব্যাহত,
আর
কলহ-দ্বন্দ্ব-সংশয়-স্বার্থপরতার ঘূর্ণিতে পাক খেয়ে
নেমে গিয়েছি আমরা
হীনতার, দৈন্যের অপমৃত্যুর
নিকষ কাল অন্ধকারে।

যে হাত বিলিয়ে দিত সারা দুনিয়ার বুকে
বেশুমার চুনি, পান্না, জমরুদ, জওয়াহেরাত
সে হাত এখন অন্যের দরজায় কৃপা-প্রার্থী,
দুনিয়ার বুকে যে ছিল শ্রেষ্ঠ বণ্টনকারী দাতা
সে আজ ভিক্ষা চায় কান্না-করুণ কণ্ঠে
একটি সামান্য তামার পয়সা !

তেরো

মুক্ত জীবনের ময়দানে,
মহৎ আদর্শের মন্‌জিলে
তুলে নিতে হলে লক্ষ্য ভ্রষ্ট জাতিকে
সকলের আগে প্রয়োজন আদর্শবাদী কর্মীর,
আদর্শকে যে গ্রহণ করেছে নিজের জীবনে পরিপূর্ণভাবে
(পূর্ণাঙ্গ আদর্শের শক্তিতে শক্তিমান
সে-ই শুধু পারে
কাহিনীর বিশালপক্ষ রক পাখীর মত
তুলে নিতে অধঃপতিত জাতিকে
পতনের গভীর খন্দক থেকে
মুক্ত আলোর নীল আসমানে)।

চৌদ্দ

যতবার চেয়েছি মিথ্যার সঙ্গে আপোষ করতে
ততবার-ই আমি হয়েছি প্রতারিত,
এ যুগের 'সাজাহ', 'মুসায়লেমা' আর 'তোলায়হা'
ততবার-ই ঘিরে দাঁড়িয়েছে আমাকে
মিথ্যা নবুয়তের দাবী নিয়ে।
একটি সত্যাশ্রয়ী প্রাণ
উদ্ধার করেছে আমাকে বারে বারে
এই অন্ধকার ঘূর্ণি থেকে
তার আদর্শের অনির্বাণ আলোকে

(মিথ্যার বিরুদ্ধে,
অন্ধকারের বিরুদ্ধে
যার সংগ্রাম আপোষহীন,
যার নেতৃত্ব
সকল নেতার অনুসরণ-যোগ্য
পরবর্তী সকল যুগে)।

অসংখ্য জ্যোতিষ্কের মধ্যে কুতুব তারার মত
নিষ্কম্প, অবিচল সেই নক্ষত্র,
মানুষের পূর্ণতার ইতিহাসে
আবুবকর সিদ্দিক নামেই পরিচিত
আখেরী নবীর সেই শ্রেষ্ঠ উম্মৎ ;
–সেই শ্রেষ্ঠ মানব।

পনেরো

ইসলামের তৃতীয় খলিফা,
হজরত ওসমান গনি
(নবীজী যাকে সম্মানিত করেছিলেন
জিন্‌নুরাইন বলে)
শুধু জাগতিক ঐশ্বর্যেই ছিলেন না বিত্তবান,
চিত্তের ঐশ্বর্যেও তিনি ছিলেন শ্রেষ্ঠ ধনী।
অপূর্ব দানশীলতা,
অতুলনীয় ভ্রাতৃত্ব আর শালীনতাবোধ
তাঁকে উন্নীত করেছে
ফেরেশতাদেরও ঊর্ধ্ব স্তরে।

নবীজী তাঁর দিকে তাকাতেন সম্ভ্রমের দৃষ্টিতে,
নবীর অনুগামী যাঁরা
তাঁরাও তাকান সম্ভ্রমের দৃষ্টিতে।

ষোল

আল্লাহ্‌র রহমতে যিনি হয়েছেন সম্মানিত
তাঁকে অসম্মান দেখিয়ে
কেউ পারে না লাভবান হতে।

ষড়যন্ত্র-নিপুণ এজিদ চেয়েছিল
একচ্ছত্র আধিপত্য আর সম্মান ;
কারবালার হত্যাকাণ্ডে
সে হয়েছে সব চেয়ে ঘৃণিত
(কুণ্ঠা বোধ করে মানুষ
যে অত্যাচারীর সঙ্গে তুলনা করতে
হিংসুক সাপ অথবা হিংস্র পশুর)।

সতেরো

প্রাকৃতিক নিয়মে
যেমন সহজ স্বাভাবিক গতিতে
ফিরে আসে রাত্রির পর দিন,
শীতের পর বসন্ত

(রাত্রিশেষের আস্‌মানে
যখন দেখা দেয় ভোরের রোশ্‌নি,
শীর্ণ শাখায় জাগে
যখন সবুজের প্রাচুর্য
নও বাহারের রঙের বৈচিত্র্য).......

পতনের পর উত্থান
আসেনা সে-ভাবে,
অতটা সহজে ; অতটা নির্বিঘ্ন গতিতে।
কওমের তক্‌দির পরিবর্তিত হয় না তত দিন
অধঃপতিত জাতি যতদিন না হয় সজাগ
কঠিন প্রয়াসের পথে
একাগ্র সাধনার পথে।

আঠারো

বিশ্বমানবের যে মুক্তি-স্বপ্ন দেখেছেন
এ যুগের শ্রেষ্ঠ দার্শনিক কবি
(কা'বাকে কেন্দ্র করে
মুসলিম জাহানের ঐক্যের বুনিয়াদে)
সে কি নিছক কল্পনা বিলাস ?

না,
তোমরা তাকে বলোনা কল্পনা বিলাস।
বস্তুতঃ এটাই একমাত্র পথ
শান্তি, সমৃদ্ধি আর পরিপূর্ণ জিন্দেগানীর।
এটাই নির্বাচিত পন্থা
হক ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করার
(সকল জালিমের জুলুমশাহী শেষ করে)।

ঐক্যবদ্ধ না হলে
বিশ্ব মুসলিমের অস্তিত্ব থাকতে পারে না কোন দিন,
আর ঐক্যের বুনিয়াদেই মুসলিম সত্তা হয় পূর্ণাঙ্গ,

অবলীলাক্রমে তখন সে ভেঙ্গে চলে
স্বার্থের সকল ক্ষুদ্র গণ্ডী,
জীবনের সকল সংকীর্ণ প্রাচীর।

গণ্ডীবদ্ধ কূপের পানি,
পুকুরের পানি,
এমনকি একটা বিরাট এলাকায় বিস্তৃত
পাহাড়ে ঘেরা হ্রদের পানির সঙ্গেও
তুলনা চলে না মুসলিম প্রাণ-প্রবাহের ;
শুধু মহা সমুদ্রের পানির সঙ্গেই
চলতে পারে যার তুলনা ;
(গণ্ডীর বাঁধন থেকে চির দিনের জন্য যে মুক্ত
সার্বজনীন কল্যাণ-ই যার একমাত্র লক্ষ্য)।

গণ্ডীবদ্ধ হলে
ঘনিয়ে আসে তার অপমৃত্যু
(যেমন হয়েছে এ যুগে)।

বিভেদের প্রাচীরে সমুদ্র হয়েছে বন্দী
সংকীর্ণ হ্রদের মত,
সামান্য জেলে ডিঙিও
ভয় পায় না এখন তাকে অতিক্রম করতে,
সামান্য খরগোশও এখন হানা দেয় তার সীমান্তে
গণ্ডীবদ্ধ সমুদ্রকে পুকুরের মত নিস্তরঙ্গ দেখেই।

এখন আর আমাদের দেখে
কেউ চিনতে পারবে না
সেই তৌহিদবাদী বিশ্ব মুসলিম সত্তাকে,
ভূগোলের সীমানা ভেঙে
সারা দুনিয়ায় যারা করেছিল
সাম্য, ভ্রাতৃত্ব আর শান্তির আবাদ,
মরুভূমিতে যারা ফলিয়েছিল জ্ঞানের ফসল,
বিরাট দ্বীপে যারা গড়েছিল সবুজ প্রাণের বসতি ;
হিংস্র নরখাদককে করেছিল মার্জিত, সভ্য, শান্তিপ্রিয়।

ভুল হয়ে গেছে সে কথা
আজ আমাদের সকলেরি,
নিকষ রাত্রির অন্ধকারে
কোথায় মিশে গেছে
হারানো দিনের উজ্জ্বল সেই সোনালি রেখা
কেউ আজ রাখেনা তার সন্ধান।
মর্সিয়ায়, ভাটিয়ালী সুরে
শুধু ব্যর্থতার কান্নাই ঝরছে এখানে
শতাব্দীর পর শতাব্দী।

তবু যখন দেখি
শ্রান্ত সাম্পান মাঝির চোখে

হঠাৎ ঝল্‌সে ওঠা
সিন্দাবাদের চোখের বিস্মৃত দ্যুতি
তখন আমি আশ্বস্ত হই,
আমি বিশ্বাস করি
ইসলামের প্রাণ-প্রবাহ আবার যাবে ছড়িয়ে
দুনিয়ার এই প্রান্ত থেকেই সারা জাহানে।

উনিশ

সামান্য বিন্দুর আকারে
দেখা দেয় যে বৈশাখী ঝড়ের মেঘ
সারা আসমানে সে ছড়িয়ে পড়ে
অবলীলাক্রমে,
ইস্‌রাফিলের শিঙ্গার ধ্বনি
যখন আমরা শুনতে পাই মেঘের বজ্রকণ্ঠে,
আর অনুভব করি
ভাঙা-গড়া,
ঝড়-ঝাপট,
বৃষ্টি বাদলের এক নতুন অধ্যায়।

অনুভব করি
অনাগত ফসলের
এক নতুন ইঙ্গিত।

বিশ

গভীর অনুভূতি
আর অবাধ কল্পনার রঙে রেঙে
জীবনের অভিজ্ঞতার উপাদান
যখন ফুটে ওঠে ভোরের রক্ত গোলাবের মত,
তখনি আমরা বলি ঃ সুন্দর সার্থক কবিতা।

কিন্তু কল্পনা-প্রবণ কবির সঙ্গে
সতদ্রষ্টা নবীর তুলনা চলে না কোন দিন।

কবিকে তোমরা ভেবো না নবী।
কবি যেখানে নবীর অনুসারী
শুধু সেখানেই তোমরা গ্রহণ করতে পারো তাকে
সত্যাশ্রয়ী লেখকের জল্‌সায়
(ইসলামী সাহিত্যের মহফিল)।

একুশ

ইসলামী সাহিত্যকে হতে হবে
একাধারে ইসলামী ভাবাদর্শে
আর সাহিত্যের গুণে সমৃদ্ধ।
কোরআন সুন্নার রোশনিতে যা হয়নি রওশন
তাকে কিছুতেই বলা চলে না ইসলামী,
আর শিল্প বিচারে যা হয়নি উত্তীর্ণ
তাকেও কোনমতে বলা চলে না সাহিত্য।
আর এ জন্যেই
ইসলামী সাহিত্যের নামে
এমন জিনিস আমরা দেখতে পাই অনেক সময়
যা ইসলামীও নয় সাহিত্যও নয়।

বাইশ

অসংলগ্ন চিন্তার অধিকারী
কোন লেখকের লেখা পড়ে
আমার মনে জেগেছিল
সেই অপরিপক্ক মাঝির কাহিনী,
বেত বনের মাঝে নৌকা ঠেলে দিয়ে যে বলেছিল
যার প্রয়োজন আছে নেমে যেতে পারে সে এখানে।

তেইশ

অস্তি বা নাস্তির প্রশ্নে এক পা এগিয়ে
বিজ্ঞান হয়েছিল দ্বিধাশূন্য,
দু'পা এগিয়ে হয়েছে দ্বিধাগ্রস্ত,
নবী সুলায়মানের দরবারে
শেবার রানী বিলকিসের অজ্ঞতা
যেমন হয়েছিল মুক্ত জ্ঞানের সম্মুখে বিপর্যস্ত।

চব্বিশ

এক অন্ধ আর এক অন্ধকে পথ দেখাবে বলে
টেনে নিয়ে চলেছে গহীন বনের অন্ধকারে
যেখানে অপমৃত্যুর খাদের মত
গভীর গড়খাই ; আর কাঁটা তারের পাহারা।
বিভিন্ন মতবাদ অধ্যুষিত দুনিয়ায়
এই তো বিভ্রান্ত মানুষের চেহারা !

পঁচিশ

আসমান-ছোঁওয়া মিনার গড়তে যেয়ে
মানুষ যখন অহংকারে হারিয়ে ফেলে কাণ্ডজ্ঞান
তখন সে সব কিছুই বুঝতে পারে
নিজের নির্বুদ্ধিতা ছাড়া
(যখন সে মনে করে নিজকে
দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী বা সেরা দানেশমন্দ)

ছাব্বিশ

শক্তি অর্জন বা ক্ষমতা দখল
যখন শুধু স্বার্থপরতা
আর আত্মপূজার জন্যে
তখন সেটা সব চেয়ে ক্ষতিকর, সব চেয়ে আত্মঘাতী
(ব্যক্তি আর সমাজ সত্তাকে যা ধ্বংস করে এক সঙ্গে
মরুভূমির মরীচিকার চাইতেও তীব্র সম্মোহনে-বিধ্বংসী গতিতে)

সাতাশ

নেতৃত্বের গদী দখল করার জন্যে
সেজেগুজে তৈরী থাকেন যাঁরা
(কৌশলী অভিনেতার মত দহ্‌লিজে আর বক্তৃতা মঞ্চে),
তাঁদের সঙ্গে আদর্শবাদী নেতৃবৃন্দের
প্রভেদ শুধু এইটুকু ঃ

আদর্শবাদীরা যেখানে ছিলেন খিদমতগার
ইস্‌লামের এবং ইনসানের ;
আদর্শহীনেরা সেখানে খিদমত-প্রার্থী
ইস্‌লামের এবং ইনসানের।

আটাশ

নতুন কিছুই নয়
দুনিয়ায় যোগ্যাযোগ্য বিচার
কেননা সঠিক মূল্যবোধ নাই যেখানে
সেখানে মুড়ি পায় মিছরির দাম
(যদিও মিছরির স্বাদ কেউ পায় না তা থেকে).....

যেমন এক বুজর্গ বলেছেন
ঃ ঈসা আলায়হেস-সালামের গাধাও
যদি মক্কায় যায়
হাজী হয়না সে ; গাধাই থাকে।

ঊনত্রিশ

জ্ঞান আর সৌন্দর্যের
সার্থক সমন্বয় ঘটিয়েছিলেন যিনি
(দুনিয়ার বহু মৌসুমের ফুল ফসল
সঞ্চিত ছিল
যে ভ্রাম্যমাণ মুসাফিরের মহৎ জীবনে)

যাঁর রচনা রীতির অনুসরণ করেছেন
অনেক কবি, মহাকবি আর প্রতিভাবান লেখক,
শ্রেষ্ঠ অভিজ্ঞতা-সম্পন্ন ইরানের সেই দরবেশ কবি
শেখ সাদীর অমর সংগীতে আমরাও বিমুগ্ধ।

আমরাও তাঁকে অনুসরণ করি
(পূর্বগামীদের মত)
মৃত্যু-তিক্ত জীবনের কাঁটা ঝোঁপ
যেন রূপায়িত হয় সুন্দর গুলিস্তানে,
আর নগণ্য মৃত্তিকা খণ্ড
রূপায়িত হয় সুরভিত মেশ্‌ক্‌-এ।

ত্রিশ

শুধু শান্ত শিশির বিন্দুই নয়,
উত্তাল বন্যা আর অশান্ত ঘূর্ণি তুফানও দেখেছি
এ দেশের মাটিতে ; ....এ দেশের জেহাদী-জীবনে।

শুধু রাত্রির নিথর নৈঃশব্দই নয়,
শব্দমুখর দিনের উদ্দামতাও দেখেছি
এ দেশের মাটিতে ;..... এ দেশের জেহাদী-জীবনে।

যদি বন্ধ করে না রাখো তোমার দৃষ্টি
তুমিও তা পাবে দেখতে,
তুমিও পারবে বুঝতে
এ জাতির স্বকীয়তা আর স্বাতন্ত্র্য।

একত্রিশ

বীরের মত বাঁচতে যারা জানে
বীরের মত মরতেও তারা জানে।
বীরের মত যারা মরতে শেখেনি
তাদের বেঁচে থাকাটা মানুষের জন্যে কলংক
তাদের মরে যাওয়াটাও মানুষের জন্যে কলংক।

বত্রিশ

জেহাদের প্রথম কথা হল
স্থির লক্ষ্য,–আল্লাহ্‌র রেজামন্দির দিকে ;
আর বিশুদ্ধ সংকল্প–(সংগ্রামের সকল পর্যায়ে)।
সংকল্পের পরিবর্তন ঘটলে
মানুষ হয়ে পড়ে
খ্যাতি, অর্থ, প্রতিপত্তিকামী
স্বার্থ সর্বস্ব দ্বিপদ প্রাণী।
মুজাহিদের মর্যাদা
সে তখন আর পেতে পারে না কিছুতেই।
লড়াই করে
এক ময়দানে, এক সঙ্গে
একজন হয় মুনাফেক
আর একজন মর্দে মুমীন।
যেমন এক বুজর্গ বলেছেন
ঃ এক-ই আসমানে ওড়ে শকুন আর শাহীন,
কিন্তু এর দৃষ্টি যখন আঁস্তাকুড়ে
ওর দৃষ্টি তখন দীর্ণ করে যায়
সাত আসমানের নীল শামিয়ানা।

তেত্রিশ

তোমরা যদি শোন বাঘের নদী পার হওয়ার কাহিনী
বিস্মিত হবে তাহলে,
যেমন আমিও হয়েছিলাম এক দিন.....

যেদিন শুনেছিলাম
অপরিমেয় শক্তির অধিকারী
জ্বলন্ত আগুন-রঙ বাঘ
যখন পার হয় সুন্দর বনের জোয়ার-উচ্ছ্বসিত
আবর্ত-মুখর বিরাট নদী
(মৃত্যুর মত যা ফেনিল, ক্ষুব্ধ আর ভয়াবহ)
তখন সে স্থির করে নেয় একটা নির্দিষ্ট লক্ষ্য।

তীব্র স্রোত অতিক্রম করে
যদি সে দেখতে পায় কিনারায় এসে
পৌঁছতে পারেনি সে তার নির্দিষ্ট লক্ষ্যবিন্দুতে
তাহলে সে উজ্জ্বল আগুন-রঙ প্রাণী
কিছুতেই ওঠেনা কিনারায়,
ফিরে যায়
যেখান থেকে সে করেছিল প্রথম যাত্রা শুরু.........

আবার সে শুরু করে নতুন উদ্যমে
নতুন অভিযান........
ফুলে, ফেঁপে ঘূর্ণীতে পাক খেয়ে
ছুটে চলেছে তীর বেগে ক্ষিপ্ত অজগরের মত
জোয়ার-উচ্ছ্বসিত যে ভয়ংকর মৃত্যু প্রবাহ
শুরু হয় সেই নদী পার হওয়ার পথে
প্রাণান্তকর প্রয়াস,
প্রতিকূল স্রোতের বিরুদ্ধে
কঠিনতম সংগ্রাম
(যতক্ষণ সে না উঠতে পারে
তার নির্দিষ্ট লক্ষ্যবিন্দুতে)।

বিপরীত কাহিনী পাবে শিয়ালের সাঁতারে,
চল্‌তি স্রোতে গা ভাসিয়ে দিয়ে
সহজ পন্থায় মতলব হাসিল করাই
যার একমাত্র উদ্দেশ্য
(মূল লক্ষ্য থেকে দূরে সরে গেলেও
বিচলিত হয় না যে বিন্দুমাত্র)!

চৌত্রিশ

দুর্বল সত্তার যে অধিকারী
তার সঙ্গে বলিষ্ঠ সংগ্রামী সত্তার
মূলগত পার্থক্য এখানেই।

অপূর্ণ সত্তা আর দুর্বল মনোবৃত্তি নিয়ে
যখন দুর্বল প্রাণী হয় সুবিধাবাদী
অথবা কৃপাপ্রার্থী,
তখন বলিষ্ঠ সংগ্রামী সত্তা
ছিনিয়ে আনে তার কাম্য বস্তু
নিজের বাহুর কুঅতে।

কিন্তু ন্যায়-নীতির প্রশ্ন ওঠে এ ব্যাপারে,
আর
প্রকৃত মুজাহিদের সম্মান
শুধু সেই পেতে পারে,—
দ্বীনী আদর্শকে রূপায়িত করেছে
পরিপূর্ণ ভাবে
যে তার নিজের বাস্তব জীবনে।

পঁয়ত্রিশ

জ্ঞান নগরীর তোরণ দ্বার
আল্লার সিংহ হজরত আলী
সর্বকালের, সকল মুজাহিদের আদর্শ।
জেহাদ করেছেন তিনি
একমাত্র আল্লার রেজামন্দির উদ্দেশ্যে।
দুশ্‌মন মুখে থুথু দিলেও
তিনি সহ্য করেছেন স্থিরভাবে
আর অম্লান মুখে উঠে দাঁড়িয়েছেন
ভূপাতিত শত্রুকে হাতের মুঠিতে পেয়েও।
কারণ, প্রবৃত্তির উপর
ছিল তাঁর পূর্ণ আধিপত্য।
নবীর খলিফা হওয়ার
পূর্ণ যোগ্যতা অর্জন করেছিলেন তিনি,
যোগ্যতা অর্জন করেছিলেন
সব মানুষের পথ-প্রদর্শক হওয়ার।

ছত্রিশ

সূর্যাস্তের পর জেগে থাকে দীর্ঘ সময়
আসমানে শহীদী খুনের লালিমা,
পথ চিনে নিতে পারে সে আলোকে
নীড়-প্রত্যাশী পাখীরা।
কিন্তু যখন অন্ধকারে ঢেকে যায়
শহীদী খুনের সেই রক্তাভা
তখন ছেয়ে যায় দুনিয়া জাহান
নৈরাশ্যের চাপ চাপ কাল অন্ধকারে,
মৃত্যুর চেয়েও যা তিক্ত, বিবর্ণ, বিস্বাদ।

আমাদের সেই সব আদর্শবাদী আর মহান নেতা
যোগ্যতা অর্জন করেছিলেন যাঁরা
নবীর আদর্শ উম্মত হওয়ার,
তাঁদের অন্তর্ধানে আমরা পেয়েছি
এই ক্লান্তিকর রাত্রির হতাশা!
জোনাকীর ক্ষীণ আলোক আর পারছে না
সরিয়ে দিতে এই কোকাফ কালো অন্ধকার।

সাঁইত্রিশ

জোনাকী-জ্বলা বিজন বনের মধ্যে
ক্ষণিক আলো ছায়ার মত
জ্বলে উঠছে আর নিভে যাচ্ছে
আমাদের সকল আশা-আকাঙ্ক্ষা!

যে আলোয় পথ চিনে নেওয়া যায় না,
যে অন্ধকারে খুঁজে পাওয়া যায় না পথের নিশানা,
সেই অস্বস্তিকর আলো-আঁধারিতেই
শেষ হয়ে যাচ্ছে
আমাদের মৃত্যু-তিক্ত দিন...
আমাদের মৃত্যু-তিক্ত রাত্রি...

আটত্রিশ

এ এক কুৎসিৎ কদর্য
অবিশ্বাসের যুগ
(কুষ্ঠ রোগীর আলিঙ্গনের মত,
কাল আজদাহার কুণ্ডলীর মত
মরণ-পাঁকে জড়িয়ে ধরেছে মানবগোষ্ঠীকে,
আর সৃষ্টি করছে দুনিয়ার বুকে
এক নৈরাশ্য হতাশার ক্লেদাক্ত জাহান্নাম)...

এখানে প্রত্যেকে করছে
প্রত্যেককে অবিশ্বাস,
আর তাকাচ্ছে সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে
একে অন্যের দিকে
দাঙ্গা হাঙ্গামার সময় লুটতরাজের ভয়ে
প্রত্যেক পথচারী যেমন তাকায়
তার পার্শ্ববর্তীর দিকে
(যখন ঘৃণা বিদ্বেষ আর অসূয়া
বিষাক্ত করে তোলে সমস্ত পরিবেশ,
আর প্রত্যেকে থাকে উদ্যত
প্রত্যেককে ছোবল হানার জন্যে
কালো কেউটে সাপের মত)...

সঙ্কীর্ণতা, স্বার্থপরতা আর মুনাফেকীর
যত রকম অপকৌশল
তার সব গুলোই বুঝি পূর্ণতা পেয়েছে এখানে...

কেননা,
ধর্ম, নীতি আর আদর্শের কথা
এখানে মুখে মুখে চালু থাকলেও
কার্যতঃ রয়েছে অধর্ম, দুর্নীতি আর আদর্শহীনতা,
আল্লার প্রভুত্ব বাচনিক ভাবে স্বীকার করলেও
কার্যতঃ আমরা মেনে নিয়েছি
শয়তানের পূর্ণ আধিপত্য।

উনচল্লিশ

বাইরে স্নিগ্ধ সবুজ ঘাসের আবরণ
আর সোনালি ফসলের আস্তরণ দেখে
কে বুঝবে পৃথিবীর তিক্ত অন্তর্জ্বালা ?

এই স্থির, শান্ত, নির্জীব জাতিকে দেখে
কে বুঝবে তার অন্তরের অসহ্য প্রদাহ ?
কে বুঝবে তার না পাওয়ার,
ব্যর্থতার বেদনা ?

কোন মঞ্জিলের দিকে তার যাত্রা হয়েছিল শুরু
আর কোথায় তাকে এনে ফেলেছে হীন স্বার্থান্ধেরা
(যখন শবভুক শয়তান ছিঁড়ে ফেলতে চাচ্ছে তাকে
মিটিয়ে দিতে চাচ্ছে তার নাম নিশানা,
যখন তার শিরায়, ধমনীতে, কলিজায়, জিগরের খুনে
অসংখ্য মারী কীট করছে আসা-যাওয়া) !

চল্লিশ

আমার স্বপ্নে দেখা দেশ,
যে দেশ এখনো পড়েনি আমার নজরে
(কিন্তু যে দেশের দিকে জেগে আছে আমার দৃষ্টি
নীড়-প্রত্যাশী ঈগলের তীক্ষ্ণ দৃষ্টির মত
গৃহ-প্রত্যাশী মাল্লার আগ্রহী দৃষ্টির মত)।
কবে সে দেশের দেখা পাব,—আমি জানি না।
কিন্তু সে দেশের খোঁজে আমার ভ্রাম্যমাণ মন
ঘুরছে দিন রাত্রির আলো ছায়ায় ঘেরা
সময়ের সমুদ্র জরীপ করে
ব্যাকুল সিন্ধু-কপোতের মত...

কেননা যে দেশ আমি চেয়েছিলাম
(সুস্থ, সবল, নিরলস কর্মীর দেশ ;

সততা, সভ্যতা আর শালীনতা প্রিয়
শান্তির দেশ)
সে দেশ আমি খুঁজে পাইনি,
সে দেশ আমার স্বপ্নেই আছে।
আদর্শে বা লক্ষ্যে অবিচল দেশের বাশিন্দা
(একমাত্র আল্লাহ্‌র বিধানকেই গ্রহণ করেছে যারা
ঈমানে আর আমলে
যাদের ব্যক্তিগত আর সামাজিক জীবনে
নাই শয়তানের আধিপত্য
নাই অন্যায়-অসত্যের প্রতিপত্তি,
নাই অশান্তির কোন প্রতিচ্ছায়া)
সকল পুরুষ যেখানে চরিত্রবান,
সকল নারী যেখানে চরিত্রবতী
সেই দেশ-ই আমার স্বপ্নের দেশ........

যে দেশে অভাব নাই সহৃদয় মনুষ্যত্বের
যে দেশে অভাব নাই অকৃত্রিম আদব লেহাজের
যে দেশে অভাব নাই গঠনমূলক কাজে সহযোগিতার,
সকল পুরুষ যেখানে কর্তব্যপরায়ণ
সকল নারী যেখানে কর্তব্যপরায়ণা।
সেই দেশ-ই আমার স্বপ্নের দেশ.........

যে দেশে দুর্নীতির নাই কোন নিশানা,
যে দেশের সকল বাশিন্দাই জানে
দুর্নীতিকে উপড়ে ফেলার পন্থা
(দুর্নীতিবাজ শয়তানকে শায়েস্তা করার পন্থা).........
যে দেশের সকল নাগরিকের মনে
জাতিকে দুর্নীতিমুক্ত রাখার প্রতিজ্ঞা,
যে দেশের সকল নাগরিকের মনে
নীতিকে পরিপূর্ণভাবে গ্রহণ করার প্রতিজ্ঞা,
যে দেশের 'বিজ্ঞ পণ্ডিতের' মনে
নাই নীতিকে খণ্ডিত করার প্রবণতা !

যে দেশের নেতা নয় ভূরি-ভোজী,
যে দেশের জনতা নয় অনাহার-ক্লিষ্ট ;
যে দেশের ব্যবসায়ী নয় অতি-লোভী,
যে দেশের ক্রেতা নয় কলহপ্রিয়
যে দেশে সততা কেনা যায়না সোনা চাঁদির বদলে ;
যে দেশে সতীত্ব কেনা যায়না সোনা চাঁদির বদলে।

যে দেশে নাই অত্যাচারী–জালিম,
যে দেশে নাই উৎপীড়িত–মজলুম ;
যে দেশে নাই অত্যাচার করার মানসিকতা,
যে দেশে নাই অত্যাচার সওয়ার মানসিকতা ;
মানুষের মর্যাদা যে দেশে হালাল কাজের ভিত্তিতে
নেতার নেতৃত্ব যে দেশে মহৎ খিদমতের ভিত্তিতে।

একচল্লিশ

একটা স্থির লক্ষ্য নিয়েই ছুটেছিল আমাদের কিশ্‌তী
(প্রতিকূল আবহাওয়ায়
উন্মত্ত তরঙ্গ তুফানে
যখন স্থির ছিল সকল সংগ্রামী মাল্লা......)

আর
জাহাজের দৃঢ় মাস্তুলের মত
দাঁড়িয়েছিল স্থির, নিষ্কম্প মাঝি
দু'চোখে তার মুক্ত ভোরের রোশ্‌নি......

অনেক রাত্রির তাঁবু দীর্ণ হয়েছিল
সে মাঝির তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে,
অনেক তরঙ্গের মাঠ আমরা পাড়ি দিয়েছিলাম
সে মাঝির অভিজ্ঞ পরিচালনায়.......

কিন্তু যখন আমরা দেখলাম বন্দরের ছবি
শয়তান এসে দিল কুমন্ত্রণা

বন্ধুর ছদ্মবেশে,
আর ঘুরিয়ে দিল জাহাজের হাল
আমাদের লক্ষ্যের ঠিক বিপরীত পথে
(কাহিনীর সেই মৃত্যু-পাহাড়ের দিকে)।

এখন যতই আমরা চলছি এগিয়ে
সেই অপমৃত্যুর পথে
ততই আমরা বিচ্ছিন্ন হচ্ছি দলে উপদলে
অবাঞ্ছিত বিতর্কে, আত্মঘাতী কলহে।

এখন শুধু আমরা দেখছি একে অন্যের ত্রুটি
আর প্রচার করছি সেটা অত্যন্ত জোর গলায়,
শুধু বদরের কথা ভুল হয়ে গেছে আমাদের
মূল লক্ষ্যের কথা জাগছে না কারু মনে।

বিয়াল্লিশ

ইস্পাহানের এক বুজর্গ আমাকে শুনিয়েছিলেন
এই কাহিনী ঃ
পাখায় পুরো শক্তি পাওয়ার আগেই
স্থির করল এক জোড়া কবুতরের বাচ্চা
সম্পূর্ণ নতুন সাফল্যের সন্ধানে
দূরান্ত সফরে যাবে তারা
কেননা,
সফরের মাঝেই জিন্দেগী
আর
সফরেই সত্তার পূর্ণতা।'

শুভ সংকল্প নিয়ে
পাখা মেলে দিল তারা রাত্রিশেষে
আর দেখতে পেল
নব বধূর মত অপূর্ব সুন্দর পৃথিবী
ডাকছে তাদের সকল মুক্ত দিগন্তে।.......

কিন্তু সম্ভব হ'ল না কোন দিগন্তেই পাড়ি জমানো
কারণ দু'টো কৌশলী দাড় কাক
নিভৃত গুহার অন্ধকারের মত কালো পাখা মেলে
পিছু নিয়েছিল তাদের অজান্তে।
প্রাণপণ চেষ্টা করেও
তারা অতিক্রম করতে পারলো না
সেই দুটো শক্তিশালী হিংস্র দাড় কাককে।
বেলা দ্বিপ্রহরের পূর্বেই
দুর্বল-পক্ষ কবুতরের বাচ্চা
শিকার হল সে দাড় কাকের।
এই কাহিনীর সারাংশ এই যে,
যে কাজের যোগ্যতা নেই তোমার
সে কাজে যোগ্যতা অর্জন করার আগে
ময়দানে নামার অর্থ
কাজটাকে বরবাদ করা
আর নিজেরাও বরবাদ হওয়া ॥

তেতাল্লিশ

ইস্পাহানের সেই বুজর্গ
বলেছিলেন বিদায় নেওয়ার আগে ঃ
যাচাই করে নিও সকল ভুঁইফোড়কে,
আর হুঁশিয়ার থেকো
পীরের আউলাদ গদ্দীনশীন পীরের কব্জা থেকে
অথবা মশহুর নেতার অপদার্থ বংশধর
নেতৃত্বকামী লোভীর চক্র থেকে।
কারণ, মাটি থেকে গজালেই
সেটা হয়না শালগাছ,
আর ঈগল বাজের সকল বাচ্চা
উড়ে বেড়ানোর উত্তরাধিকার পেলেও
সত্যিকার মানুষের ওয়ারিশ হয় খুব কম লোক।

কেননা
কঠিন শ্রম আর প্রয়াসের পথেই
অর্জিত হয় মানবিক যোগ্যতা,
সুবিধাবাদের সুযোগ নাই এতে,
এ ব্যাপারে নাই কোন সহজ পন্থা।

চুয়াল্লিশ

যারা চেয়েছিল তাদের প্রসারিত হৃদয়
যারা চেয়েছিল তাদের সুরভিত মস্তিষ্ক
তারা শুধু আনলো সঙ্কীর্ণতা,
তারা শুধু আন্‌লো আবিলতা
অপ্রেম, অবিশ্বাস
আর পদস্খলনের জন্যেই।

যারা চেয়েছিল তাদের নির্ভুল লক্ষ্য
যারা চেয়েছিল তাদের নির্ভুল মঞ্জিল
তারা হারিয়ে ফেললো সেই লক্ষ্য
তারা হারিয়ে ফেললো সেই মঞ্জিল
শুধু স্বার্থের খেলায়
শুধু সাময়িক প্রলোভনে।

পঁয়তাল্লিশ

যত ঘোরালো হোক আশাভঙ্গের অন্ধকার,
যত জটিল হোক সমস্যার গ্রন্থি,
আদর্শবাদী ঈমানদারের কাফেলা
তবু মুষড়ে পড়ে না কোন দিন,
সাচ্চা মুজাহিদ
কোন দিন-ই ভেঙে পড়ে না সে আঘাতে,
অন্ধকার জুলমাতের এলাকাতেই,
সে খুঁজে পায় আবে-হায়াতের সন্ধান
আল্লার রহমাত প্রাপ্ত বান্দা খিজিরের মত।

সমস্যা-কুটিল শতাব্দীর ঘূর্ণাবর্তে
আজ তাই কিছুতেই চলবে না
থমকে দাঁড়ানো,
কা'বার আলোকরশ্মিতেই
আজ আমাদের করতে হবে
সকল সমস্যার সমাধান ;
দিতে হবে সব সওয়ালের জওয়াব।
যদিও কৌশলী চক্রে
কাফেলার অগ্রগতি হয়েছে ব্যাহত,
যদিও শয়তানী চক্রান্তে
আমরা হয়েছি ছিন্নভিন্ন,
তবু সুব্‌হে উম্মীদের পথে
আমাদের এগিয়ে যেতে হবেই,
বাইরের মত
এ সব ভিতরের বাধাকেও অতিক্রম করে।

ছেচল্লিশ

সমস্ত ঘুমন্ত শিশুকে বুকে নিয়ে
যখন ঘুমিয়ে পড়ে পৃথিবী
শূন্যে ভাসমান এক বিশাল দোলনার মত,
তখন জেগে থাকে শুধু ধ্যানীর দৃষ্টি
অতন্দ্র তারাদের সাথে
রাতজাগা পাখীদের সঙ্গে.........

স্বপ্ন দেখে সে হাবেদার মরু প্রান্তরে
এক নতুন ভোরের,
স্বপ্ন দেখে এক নতুন যুগের.......

দুচোখ বেয়ে যখন নেমে আসে
দু'ফোঁটা শিশির বিন্দু
দুনিয়ার সব দৌলতের চেয়ে কিম্মতী
সকলের চেয়ে দামী।

সাতচল্লিশ

এবার বিধ্বস্ত পৃথিবী গড়ে তোলার পালা
(খিজিরের সঙ্গে মুসা কালীম
যেমন গড়ে তুলেছিলেন
আদম-সন্তানের জন্য এক ধ্বংসমুখী-প্রাচীর
যখন ক্ষুধার অন্ন ছিল না কাছে,
ছিলনা শব্দিত দিনের আনন্দ কোলাহল,
ছিল শুধু এক হিংস্র প্রতিকূল পরিবেশ
আর, আল্লার রেজামন্দির উদ্দেশ্যে
কাজ করার একাগ্র বাসনা) !

আটচল্লিশ

যে মরু মাঠ পাড়ি দিতে যেয়ে
ঘূর্ণীর মুখে ঝরে পড়েছে, অসংখ্য প্রাণী
বৈশাখী ঝড়ের মুখে শুকনো পাতার মত,
সেই প্রান্তর পারি দিতে এসেছিল
এক দিন এক নির্ভীক মুসাফির
স্থির তার লক্ষ্য
অবিচল তার সংকল্প......

ক্ষিপ্ত আজদাহার ফণার মত
আসমান ছোঁওয়া তরঙ্গ দেখে ক্ষুব্ধ কহর দরিয়ার
(যেখান থেকে ফিরে গেছে সকল মাঝি মাল্লা)
সেই দরিয়া পারি দিতে এসেছিল
একদিন এক নির্ভীক মুসাফির
স্থির তার লক্ষ্য
অবিচল তার সংকল্প......

মিথ্যা কুহক আর যাদু তেলেস্‌মাতের ডেরা
জ্বিন শয়তানের আস্তানা বাদগর্দ হাম্মাম

(যেখানে সকল মানুষ ভুলে যায়
সত্তার পূর্ণ বিকাশের কথা,
আর ঝিমিয়ে পড়ে আচ্ছন্ন, অচেতন অবস্থায়
ইব্লিসের জিঞ্জিরে)
সেখানে এসেছিল এক নির্ভীক মুসাফির
স্থির তার লক্ষ্য
অবিচল তার সংকল্প.......
পার হয়ে গেছে সে এক আশ্চর্য শক্তিতে
হাবেদার বিশাল মরু-প্রান্তর,
পাড়ি দিয়েছে সে ক্ষুব্ধ কহর দরিয়া,
ভেঙে গেছে বাদগর্দ হাম্মামের সকল যাদু-তেলেসমাত।
আর রেখে গেছে
সকল পাহাড়,
সকল সমুদ্র,
সকল মরুভূমি অতিক্রম করার
এক নির্ভুল ইশারা।

ঊনপঞ্চাশ

আমার কথা শেষ করতে হবে এখানেই
কারণ, সময় আমাদের সংক্ষিপ্ত
আর মন্‌জিল এখনো বহু দূরে।

যে রুক্ষ, কঠিন পৃথিবীতে,
শান্তিহীন, সান্ত্বনাহীন যে বিয়াবানে
কাফেলা হয়েছে লক্ষ্যহারা,
ছন্দহীন মিলহীন, সুরহারা
হাবেদার সেই মরু-প্রান্তর
(এক দিকে যার ক্ষুব্ধ কহর দরিয়া
অন্য দিকে লুব্ধ বাদগর্দ হাম্মাম)
শুধু অকল্যাণ আর অশান্তির বাসা।......

জীবনের পূর্ণ বিকাশের পথে,
প্রতি পায়ে
এখানে বাধার জগদ্দল পাথর,
এখানে বীজের সম্ভাবনাকে নষ্ট করে
কৌশলী শয়তান,
প্রাণবন্ত সবুজ চারা গাছ
(বৃক্ষে পরিণত হওয়ার আগেই)
এখানে ধ্বংস হয়ে যায়
ইব্‌লিসের কূট চক্রান্তে !
সত্তার পূর্ণ বিকাশ এখানে অসম্ভব,
অসম্ভব এখানে পূর্ণ শান্তির প্রত্যাশা।

কাজেই আল্লার নামে শুরু হোক সেই সফর
আল্লার পথে শুরু হোক সেই জেহাদ,
সত্তার সকল অপূর্ণতা
যাতে হয় সম্পূর্ণরূপে অপসারিত,
অশান্তির সকল কাঁটা ঝোঁপ
যাতে হয় সমূলে উৎপাটিত,
শোষণ-ত্রাসনের সকল আজদাহা
যাতে হয় সবংশে নিহত..........

যেন বঞ্চিত বনি আদমের এই দীর্ঘশ্বাস
রূপ নিতে পারে শান্তির প্রশ্বাসে,
যেন এই তৃষ্ণাতপ্ত হাবেদার মরু মাঠ
আবার হতে পারে
সুন্দর শান্তিময় মাটির জান্নাত
দুনিয়ার সকল মানুষের জন্যে
দুনিয়ার সকল মানবীর জন্যে ॥

ইফাবা—২০০৪-২০০৫ / প্র-৩০৯৫(উ)—৩২৫০



ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ